কুড়মালি সংস্কৃতি
ও
তন্ত্র ধর্ম

সিরিপদঅ বঁসরিআর

কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্র ধর্ম

সিরিপদঅ বঁসরিআর

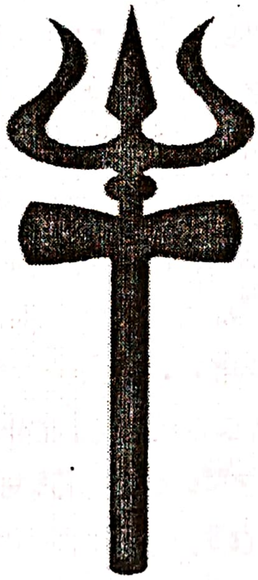
মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি
রামকৃষ্ণপুর, কালুহার, পুরুলিয়া

উৎসর্গ

কুড়মালি ভাখি উজাগরেক আগদহলি

কেশব টিড়ুআর

লক্ষীকান্ত মুতরুআর



মুখাড়

হালুক ঝাড়গাঁউআঁ, পচ্ছিম মেদনিপুরিআ, বাঁকুড়িআ, পুরইলাক পুরবিআ কুড়মিক আর মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসিক আড়হানে কুড়মালি চারি ও তন্ত্র ধর্ম (কুড়মালি চারি আর তনতঁত ধরম) পথিটা বাঁগলা ভাখি মাঁহাঁন জড়েলাই দাইএ গিরলরহঁ। বাঁগলা ভাখিঁই কাহে কনঅঁ ভাখিঁই পথি জড়েক নিআঁর চখঅ গেধি, গেআন আর মনমনানি মনমনাই এক মনঅ নহিঁসাহিত সিরজইআ নহঁ। কহে পারিহা নিকুম, নিমুরাদিআ, বেগরলুরিআ কুড়মি সমাজ সেবইআ হেকঁ। পড়হুআ ছউআ রহা জিনগানি লেই সমাজ সেবা মাঁহাঁন সঁঝড়ালরহঁ। উ-পেরিআঁই কুড়মি খতরিঅ হুইলমাইলকর হুমদুমি চলে হেলেইক। ১৯৮০ সনে রাঁচী দুনিআদারি পাঠসারে কুড়মালি ভাখিকে এলাকাহি ভাখিক মাইনে পড়হাসুনা করে হুকুমনামা দেলাহেইক। অহে অরে কুড়মালি ভাখিকে ঝবরাউএ পসরাউএ অহে ১৯৮০ সনে মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি নামিআঁ একটা গঠুএরি গড়হালাহেইক। তাহে পেরিআঁইএঁ অহে গঠুএরিঁই গঠালাহঁ।

ভাখি ঝবরাউঅনে জাইত চিনহাপ টউরালেইক। সাবুত পাউআলাহেইক দরবিড়িআ গুসটিধারি কুড়মি আদিবাসি হেকঅত। ১৯৫০ সনকর ৫ সেপ্টেম্বর তড়িক এরা আদিবাসি পাঁইত গেনন গেনতিঁই গেনালরহত। আপন জাইত চিনহাপ জিআউএ আর আদিবাসিক কানুনি হঁক উসুল খাতির আদিবাসি হুইলমাই উচরলেইক। গটা কুড়মি মুলুক র কুড়মি হুইলমাইলে একঠিন গঠালা। হুইমাইল দিলিলিঁই থেচকঅলেইক।

ই-বাটে ভাখি হুইলমাইলকর জরক সটকলেইক। রসে রসে বহেহেইক। জরক সটকনিক দসর হেতু ফেড়ে উরুবুকার করল মুলুককর কুড়মিক হিআঁই ভাখি বাটে মন গড়এইন নিঁহি। অখর পরতুকআরাক গালমারা ভাখিটা বাঁগলা ভাখি হেকেইক। মেনতুক ভেউরাউনিঁই সাবুত পাউআইক ভাখিটামুল সাড়া বাঁগলা ভাখিক সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়া নহেঁইক। বিচকুম কুড়মালি ভাখিক সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়া হেউআক সাবুত পাউআইক। আবগা পাইনটা বাঁগলা ভাখিক পাইন হেকেইক। কুড়মালি ভাখিক সাড়াক সঁগ বাঁগলা ভাখিক পাইন জড়িকন রাঢ়হি বাঁগলা নামে নামাউলাথিক। কনঅঁ রকটেকনিঁ বধইআকে রাঢ় কথিক। অহে অরে বাঁগলা ভাখিক উসরন সুর, টুম গড়হন বেহুঁ, ভাঁউঅর হেনতেন কনঅঁ রকটেক নিঁ বধইআ ভাখিটাকে রাঢ়হি বাঁগলা কহলাথিক। বেস কাথা বাঁগলাভাখিক রকটেক নিঁ বধেইক অহেখাতির রাঢ়হি বাঁগলা নহেঁইক। মেনতুক কুড়মি মুলুককর সিঁআড়ে বাদাড়ে আউতানে দগদগিআ উখড়ি রহি কুড়মালি ভাখিক রকটেক বধঅনি বাটেলে একর নাম রাঢ়হি কুড়মালি রহা ভাখি বাছন কাননে কানুনি রহেইক। আর ইটা আঁইআঁ কুড়মালি হেকেইক। রেগরেগিআ রুগড়ি ভুঁইআঁ রাঁগা রাঢ় মাটিক মুলুকে চাসকাম করেইতকে বাপে বেটাঁই একটি চুটিই তামুক খাউআ রাঢ় কুড়মিক মাঁইভাখি রাঢ়হি কুড়মালি হেউআটা সাজনকর হেইতেলেইক। ভাখি বাছন কাননে কানুনি হেইতেলেইক। মেনতুক আপন ঘার ভরে আপন নিমুরাদিআ ভাখি পকতাউএ আঁইআঁ রাঢ়হি কুড়মালিকে রাঢ়হি বাঁগলা নামে নামাইকন কুড়মালি ভাখিকে বাঁগলা ভাখিক ঠেঁগড়ি (উপভাষা) সাবুত করেক বেগরভেদেক কসনি। বেগরভেদেক জবরাঁগি নিঁহি ত অ কিনা ঢেঁসনা ডুঁল একটা টুস কহহঁ সঁড়হউরটা ইঁড়কিছে কাড়াগিলার গঠটাই হেলাঁই দে। টুমটাক একটাউ সাড়া বাঁগলা ভাখিক সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়া হেকেইক? টুমটা গড়হেক গড়হন বেহুঁ কিনা বাঁগলা ভাখিক টুম গড়হন টঁগে আহেইক? কইটা বাগালিঁই টুমটাক মানে বুঝতা? এহে ভাখিটাকে রাঢ়হি বাঁগলা কহাটা বেগরভেদেক জবরাঁগি নিঁহিঁ তঅ কিনা হেকেইক?

আবগা এহেটোই নিঁহি ভাখি-চারি ঢুড়ইআরাঁই ঢুড়হি তই করলাহাত ভাখিই সিরজেইক চারি মেনতুক চারিই ঢহি জিউআউএইক বহি জিউআউএইক ভাখিকে। অহে অরে রাঢ়হি বাঁগলা ভাখি চালু রহল মুলুক মাঁহান চালু রহল চারিটা বাঁগলা চারি হেউআ সাইবত মাঁহান সাঁচা রহেইক। ঢুঁড়হনে ঢুঁড়হালাহেইক বাঁগলা চারি গড়হালাহেইক ভাই আর জাঁউআইকে লেইকে। মেনতুক উরুবুকার করল মুলুক মাঁহান চালু রহল চারিটা আঁইআঁকুড়মির সিরজল চাসকাম অরে

চাসকাম মাঁহান সাইবতে চাসকামে মাঁহাঁমাঁইকর আসিস দেউঅনে মাঁহামাইকে সেউরন ঢঁগে গড়হালাহেইক। অহেখতির কুড়মিক সিরজল চাসকাম অরে গড়হাল অহে চারিটা কুড়মালি চারি নামে চালু আহেইক। চারিটা কুড়মালি আর ভাখিটা রাঢ়হি বাঁগলা? ইটা কুড়মিকে কুড়মালি ভাখি বিসরাউএক আর কুড়মি জাইতকে আপন জাইতকে ঘিনাউএক একটা ডাগর চাইল চাললাহাত। অহে চাইলে আর কুরমি খতরিঅ হুইমাইলে বাভন কুড়মিক আনগাঁই ঠঁড়হুআলাহে মেনতুক ঘার সামাইনি পারে। কাথাটাক মানে বিহাক ঘার ভরা নেগে, খির খাউআ নেগে মনতর ফুঁকে ঘার সামাইনি পারেই। বিহাক সলঅটা নেগে আবগা সিঁদরাদানে বাভনকর বাস পাউআইক আর অহে বাসে কুড়মিঁই বিহাকে বাভন বিহা নামে নামাউলাথিক। মরখি কামানে বেজাঁই নেগ মাননকর বিসবিসুআস চাইড় রহেহেইক মেনতুক আবগা পিনডি পাড়া নেগে বাভ আনগাঁই ঠঁড়হুআইএক হঁক পাউলাহে তাউএ কুড়মিঁই বচকত বাভন লেইকে কামান। ইগিলি কুড়মিক কুড়মালিঁই বিততাপ। বাছটগেআন (বিজ্ঞান) অরে গড়হাল কুড়মালি চারিক কাঁধে দাঁপ দেইকন সিঁদধু মুঘড়ামু গড়হাল পেরিআলে চলঅত রহা বাপ আজারাক মানি চলা কুড়মালি চারিকে ঘিনাঁইকন বেগরবুঝি হিন্দু চারি বাটে লহকনি আপনকে নাসন হেতু হেকেইক কাহে নঅঁ হিনদু ধরম বা হিন্দু চারি মাঁহাঁন বাছটগেআনকর কনঅঁ লসদগা টুঁড়হাইকনিঁহিঁ। বিচকুম পাইআ (পদ) আরদসনকর মুঁভরতি গালমারন সাড়া সুনাইক।

সিঁদধু সুঘড়ামু গড়হাইএক মূলে বুড়হাবাবা-মাঁহাঁমাঁইকে আরদাসন অরে গড়হাল কুড়মালি চারিক তিন খেজা লেইকন সউআঁগ জখে কেসনঁমেসনঁ ভুলেভালে ভরাই জড়িকন কুড়মি মুলুককর কুড়মিকমগজে নুড়েক কসনি করালেইক। হেঁট মুড়াইকে ইঁমান মানহঁ ভুলচুক আহেইক। কুড়মালি চারি নিআঁর ডাগর চারি লেইকন তচবিচ করা সঁপড়িকন ভুলচুকে চুকন নহেঁইকা কাহে নঅঁ এহে চারি লেইকন চিসাল নিখরাল পথি টউরাইক নিঁহিঁ। পেরিআক পেরিআলে মুঁহেঁ মুঁহে আর নেগ-চার মানন ছেউরে চলি আউঅল চালাই আউঅল বাটেলে চালু আহেইক। বেঁজাই ডাগর কুড়মি মুলুককে বেজাঁই খাঁধাঁই খাঁধা বাঁটনে খাঁধাইহি নেগ-চার মাননে রিচিক আধেক অগলদিগল হেলাহেইক। তাউএ মুল নেগ-চারগিলাকসিরজাল অর উধনাঁইক বাছটগে আন টুঁড়হেক সউআঁগ জখে কসনি করালাহেইক। টুঁড়হনে বা টুঁড়হন ডহর বেঁউড়াউঅনে টুঁড়হন মাঁহান ভুলচক রহা সাবুত পাউআলে সুঘড়াউএ আড়হাইকন দাদনখউকা গনবেহে।

তনতঁত সাধনবল - মাহাবল। ই-বলকর মাঁহাঁমাইকে বুঝন বল আহেইক। অহেখাতির সিরজন তঁত লেইকন একর মতকে হালি পেরিআক বাছটগে আনে হঁ মান মানেইক। হালি পেরিআক বাছটগেআনকর মগজ আহেইক সিনেই নেখেইক। তনতঁত সাধনকর মগজকর সঁগ সিনেই সঁঝড়া-লাহেইক। অহে মগজ আর সিনেই সঁঝড়ান অরে গড়হাল কুড়মালি চারিকে কুড়মিঁই ছি-থু করে হেথিক ঘিনাউহেথিক। নেগ-চারকর দাঁপে দাঁপ দেই ভরমাহাত। গিলিখাউকারাক বেগরভেদে নেগ-চার সঁগ আপন নেগ-চারকে

ভজনাউঅল নলাহেইক। অহে সকে-দুখে হিআ কাঁদেহেই তনতঁত সাধনকর তঁত কুড়মালি চারি মাঁহান সঁঝড়াল তঁত সউআঁগ জগে বুঝন অরে ফদড়লঁ। এহে ফদড়অনিটাই সিরান না মানিহা। ইটাকে টুঁড়ন অর মানি আপন বাটেলে টুঁড়হেক কসনি করেক উচকাউনি মানবাহাক। উচকাউনি পুলকাউনি মানি টুঁড়হে ঠেসলে খাটালিটা পসাতি। সমাজঠিন নিছুসাঁচা তঁত পরসাতেইক। বাঁগলা ভাখি মাঁহান জড়অল খাতির সমাজঠিন দসিদার রহলঁ। জহাইর।

সিরিপদঅ বঁসরিআর

প্রস্তাবনা

কুড়মি ও কুড়মালি আজ একটি বহুল চর্চিত বষয়। তবুও বলা যায় কুড়মি ও কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতির কোন প্রামান্য ইতিহাস আজও লিখিত হয়নি। অনুমান ও ধারনাকে ভিত্তি করেই পন্ডিত গবেষকগণ যা বলছেন- তা হলো ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবময় কৃষি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেই এই জাতির ইতিহাস ওতোপ্রোত জড়িত ও গভীরভাবে সম্পর্কীত। এই জাতিই তার প্রধান ধারক ও বাহক।

জানা যায় দ্রাবিড় 'কুর' বা 'কুড়' শব্দের অর্থ হলো ধান বা চাল। কুড়মালি ভাষাতে আজও 'কুঁড়া' বা 'কুঁঢ়া' অর্থে ধান বা চালের বিশেষ অবশেষ অংশকেই বোঝায়। তাই ঐ 'কুড়' বা 'কুর' ধাতু বা শব্দ থেকে বিভক্তি যোগে 'কুড়ম' বা কুড়মি শব্দটি গঠিত তা বলা যায়। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি গ্রন্থে ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এই শব্দের বহুজনিত রূপের ব্যখ্যায় বলেছেন- "কুল্য শব্দের মূল কুল (লেটিন Colo) অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা।" পন্ডিতগণ এও বলে থাকেন যে - এই কৃষি শব্দটি থেকেই নাকি কৃষ্টি শব্দটিরও উৎপত্তি। তারা বলেন কৃষি শব্দের অর্থ লোক সমূহ (People) এবং কৃষ্টি অর্থে সমস্ত কৃষকের দল বোঝাত। এই লোক সমূহ বিভিন্ন 'কুল' বা কৌমে বিভক্ত ছিল (Clan) প্রত্যেক কুলেই একটি নির্দিষ্ট দেবতার উপাসক ছিল। আমরা এও ভাবতে পারি যে, কুর, কুড়, কুল, লেটিন Colo, Cult, Cultivation, Culture শব্দগুলি ঐ একটি বিশেষ ধাতু থেকেই সৃষ্ট।

কুড়মি জাতির কৃষি ভিত্তিক এই কৃষ্টি সংস্কৃতির শ্রেষ্ট ও মহত্বপূর্ণ আচার উৎসব হল করম এবং সহরই-বাঁদনা। এই উৎসব দুটি প্রমাণ করে কৃষির উদ্ভব ও ইতিহাসের সঙ্গে কুড়মির সম্পর্ক এবং অবদান কি? এমন দাবী আজ উঠে এসেছে যে, জাওয়া-করম হল কৃষি আবিস্কারের স্মৃতি উৎসব এবং হার বা লাঙ্গল গরু-কাড়ার সহযোগে প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থারও উদ্ভাবক ও সূচনা করেছিল এই কুড়মি জাতি এবং তাদের বুঢ়াবাপ মহাদেব শিব। কুড়মালি লোক পুরাণ কথা ও লোকশ্রুতি সে কথায় বলে।

কেবল কি করম (কর্ম), ধরম বা ধর্মেরও উদ্ভাবক এবং প্রতিষ্ঠাতা, প্রবক্তা ছিলেন কুড়মির বুঢ়াবাপ, ঐ যুগপুরুষ মহাদেব শিব। সেই ধর্মই হলো তনতঁতের ধর্ম বা তন্ত্রধর্ম।

স্বয়ং শিব নিজেই একাধারে ছিলেন- যোগীরাজ, ধর্মরাজ, নটরাজ। নৃত্য ও সংগীতের স্রষ্টা। তান্ডবের (তন-ডবকা) গুরু। এখনও বহু পন্ডিতজন এই মত পোষন করেন যে, জরথুষ্ট ছিলেন বিশ্বের প্রথম ধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু সে যুক্তি সম্পূর্ণ অসার ও অবাস্তব। যোগ ও তন্ত্র ধর্মই হলো মানব সভ্যতার প্রথম ধর্ম দর্শন। যা জরথুষ্ট-এর পূর্বে তো বটেই, বেদ বা বৈদিক

সভ্যতারও বহু পূর্ববর্তী। সিন্ধুর কৃষি সভ্যতায় এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কেবল লালিত নয় সিন্ধু সভ্যতায় তন্ত্র লোকধর্ম রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে পরম্পরা কুড়মি জাতি আজও বহন করে চলেছে। তার জীবনের সমস্ত কর্মে। বিশিষ্ট লোক-গবেষক শ্রদ্ধেয় শ্রীপদ বংশরিআর তাঁর 'কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্র ধর্ম' গ্রন্থে সে কথা প্রমানিত করেছেন। কুড়মি ও কুড়মালি গবেষনায় নিঃসন্দেহে এটি একটি মৌলিক ভাবনা। সে কাজে তিনি কতটা সফল তা সুধী পাঠক বলবেন। কিন্তু এই মৌলিক বিষয়টি প্রথম উন্মোচনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। আসলে হিন্দু তন্ত্র, বৌদ্ধ তন্ত্র বলে কিছু হয় না। তন্ত্র হল ভারতের আদিম অধিবাসীদের। যার অন্যতম হলো এই কুড়মি জাতি।

কুড়মি জাতির সমাজ, সংস্কৃতি, করম, ধরম, মরম, আচার আচরণ, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি নেগাচারি পুরোপুরি যে তন্ত্র আধারিত তা প্রমাণ করার প্রয়াস করেছেন লেখক। গ্রন্থটি অনুরাগী পাঠক, উৎসাহি গবেষকদের কাছে যে উপাদেয় ও একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট চর্চা ও গবেষণা সংস্থা " মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসির' তিনি সম্মানীয় সভাপতি। বলা যায় পথ প্রদর্শকও। এই গ্রন্থে তাঁর চিন্তা, গবেষণা, মনন কেবল ভাখি বাইসিকে নয় সমস্ত সমাজকে আগামী দিনে পথ দেখাবে, এই কামনা করি।

কিরীটি মাহাত
সম্পাদক
মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি
রামকৃষ্ণপুর, পুরুলিয়া (পঃ বঃ)
৫/৬/২০২১

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা লব্ধ নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে প্রাগবৈদিক, প্রাগঐতিহাসিক যুগে তৎকালীন জম্মুদ্বীপে তথা ভারত ভূখন্ডে কৃষিভিত্তিক, নগরকেন্দ্রিক একটি উন্নতমানের সুসভ্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত ছিল। বহু নিদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেছে উক্ত সভ্যতা গঠনকারী নরগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল। সেই সভ্যতার সংস্কৃতি ছিল বৈষয়িক সংস্কৃতি। সেই সস্কৃতিতে সাংস্কৃতবান লোকেরা শিব ও শক্তির উপসনা করত। সেখানেই প্রথম শিব ও শক্তির আদিরূপ লিঙ্গ পূজা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে উক্ত শিব ও শক্তির উপাসনা করার হাত ধরেই তন্ত্র ধর্ম বিকশিত হয়েছিল। আর্যাগমনের পরবর্ত্তীকালে আর্যগণ সিন্ধু সভ্যতার তন্ত্র ধর্মকে ব্রাত্য ধর্ম নামে অভিহিত করেছিল।

উল্লেখ করা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ছিল। মানুষের উদর পুরনের আহার্য শস্য দানা কৃষিকর্মে দ্বারা উৎপাদন করার পথের দিশারী উক্ত সভ্যতা গঠনকারী নরগোষ্ঠীর গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারী সমাজ। উদাহরণঃ- আরন্যক জীবন যাপনকালে যারা, যেমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু-বিকলাঙ্গ, গর্ভবতী এবং প্রসূতী নারীগণ আরণ্যক আহার্য বস্তু সংগ্রহে অক্ষম ছিল। তাদের সকলের আহার্য বস্তু আস্তানাতে সঞ্চিত রেখে সক্ষমেরা গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারীগণকে অর্পন করে পুনঃরায় আহারের যোগাড়ে যেত। এমতাবস্থাতে সঞ্চিত আহারের অপ্রতুলতা কারণে জল সংগ্রহ হেতু গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারীগণ স্রোতস্বিতে গমনকালে স্রোতস্বি তটে প্রকৃতি মাতার কোলে প্রাকৃতগুণে উৎপাদিত অজানা-অচেনা শস্য দানা ক্ষুধার তাড়নাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভক্ষণে বাধ্য হয়েছিল। উক্ত শস্য দানার স্বাদে, গুণে এবং ক্ষুন্নিবৃত্তিরগুণ সম্পন্নতাতে তারা মুগ্ধ হয়েছিল। কল্পনা করে ভূমি বন্য অবস্থায় অর্থাৎ কর্ষবিহীন অবস্থাতেও আহার্য শস্য দানা উৎপাদন করে। এতৎকারণে নারী জাতি ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। উক্ত কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে শুরু করে পুরুষ যদি নারীরূপ কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হতে পারে তাহলে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য দানা উৎপাদন করা যাবে না কেন? নারীরা পুরুষের লিঙ্গ স্বরূপ এক যষ্ঠী বানিয়ে

ভূমি কর্ষণ করে আহার্য শস্য দানা উৎপাদন করল। লিঙ্গরূপী ষষ্ঠী হচ্ছে সহনশীল এবং ভূমিরূপী পৃথিবী ও নারী হচ্ছে সক্রিয়। সক্রিয় মানেই হচ্ছে শক্তির আধার। ফসল তোলার পর যে প্রথম নবান্ন ভক্ষনের উৎসব হলো সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবী অথাৎ ভোগ যুক্ত বান অর্থাৎ ভগ সংযুক্ত বান মানে ভগবান এই পথেই লিঙ্গ পূজার প্রবর্তন ঘটলো। এই আদিম ধারণা থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল শিব ও শক্তির কল্পনা, আরাধনা, উপাসনা শিব ও শক্তির উপাসনার হাত ধরেই উদ্ভুত হয়েছিল তন্ত্রধর্ম। তন্ত্রধর্ম মন্ত্রমুলক নয়, ক্রিয়ামূলক। গবেষকগনের অভিমত তন্ত্রধর্মের ক্রিয়া প্রকাশের ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষাতে কথ্যরূপে পাওয়া যায়। তাতেই নিশ্চিত হওয়া যায় তন্ত্রধর্ম বা সাধনা দ্রাবিড়ীয় দ্বারা উদ্ভুত। শব সাধন, পঞ্চমুন্ডি আসন, মদ্য, মৎস, মাংস এ সবই তো তন্ত্রধর্মের উপাদান। নারী সঙ্গই হচ্ছে তন্ত্রধর্মের প্রধান অঙ্গ। ধারনা করা যেতে পারে তন্ত্র ধর্মে মদ্য, মৎস, মাংস এগুলো উপাদান হওয়ার কারণে আর্যগণ এই ধর্মকে ব্রাত্য করেছিল। এতৎকারণে তন্ত্রধর্ম মতে মদ্য, মৎস, মাংস এগুলো সঠিক ব্যাখ্যায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধ করার কারণ আর্যাগমনের পরবর্ত্তীকালে আর্যগণ তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম ভারতভূখন্ডে আদিম যুগ থেকে বসবাসকারী আদিবাসী অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের আর্য ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের প্রচার, প্রসার ঘটিয়ে গ্রহণ করানোর জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা অনার্য জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে যেমন বিভিন্ন প্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করার পথ বেছে নিয়েছিল তেমনি বলপ্রয়োগ করতে ও দ্বিধাবোধ করেনি। অতএব বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাক বা না থাক অনার্যগণের তন্ত্রধর্মকে ব্রাত্য ঘোষণা করে তাদের অন্তরে নিজ ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা, অনীহা, ঘৃনার মনোভাব জাগরিত করাটা ছিল মূল উদ্দেশ্য। এর প্রধান কারণ ছিল বহিরাগত আর্যগণ জানতো মাতৃভাষা মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

যাই হোক তন্ত্র ধর্ম মতে—

মদ্য ঃ- ব্রহ্ম রন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার থেকে যে অমৃতধারা (কারনবারি) নিসৃত হয় তাহা যিনি পান করার সাধনা করেন বা সক্ষম হন তাকে মদ্য সাধক বলা হয়।

মৎস্য ঃ-তন্ত্র ধর্মে বাহ্যিক জগতের জলচর প্রাণী মৎস্যকে বোঝায় না। জীব দেহস্থিত ঈড়া এবং পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী মধ্যে অহরহ মৎস্যরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলমান আছে। সাধকগণের মতে স্বাভাবিক অবস্থাতে প্রতিটি জীবদেহে প্রতি ২৪ ঘন্টাতে এই ক্রিয়া ২১৬০০ বার চলমান আছে। যে সাধক শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ এই দুই মৎস্যকে ভক্ষন করেন অর্থাৎ স্থির রাখতে সক্ষম হন তাঁকে মৎস্য সাধক বলা হয়।

মাংস ঃ- তন্ত্র ধর্ম্ম মতে মা শব্দে রসনা বুঝায়! রসনার অংশ বাক্য। যে সাধক রসনাকে ভক্ষন করেন অর্থাৎ বাক্য সংযম করেন তাঁকে মাংস সাধক বলে। বাক্য সংযম করার ক্রিয়া তালুমুলে জিহ্বাকে প্রবেশ করালেই বাক্য সংযম করা হয়। সুতরাং জিহ্বার সংযমে বাক্যের সংযম হয়। এইভাবে তন্ত্র ধর্ম মুদ্রা ও মৈথুন আরো দুটি 'ম' কারের সাধনা করা হয়।

সর্ব্বমোট পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা করা তন্ত্র ধর্মের একটি উপাদান। আর্যগণের আর্য ধর্মের কর্মযোগ অনার্যগণের তন্ত্রধর্মের নামান্তর মাত্র।

যে অনার্যগণ তন্ত্র ধর্মের স্রষ্টা সেই অনার্যগণ আর্যাগমনের পূর্ব্বে দ্রাবিড়ীয় নামে পরিচিত ছিল, আর্যাগমনের পরবর্ত্তীকালে তাদের পরিচয় উল্টোপাল্টা হয়ে অনার্য হল। আর্যগণের পরিচয় অল্প কথায় বলা যেতে পারে, যে বা যারা বেদ এবং বেদের বিধান মেনে চলে সে বা তারা আর্য। অপর দিকে এক কথায় বলা যেতে পারে যে বা যারা আর্য নয় সে বা তারা অনার্য। অতএব বলা যেতে পারে যে বা যারা হয়েছে "কল, কুড়মি, কড়া, বেদ বিধি ছাড়া"। অনার্য এই কল, কুড়মি, কড়ার দুটি বিভাজন রয়েছে। কল অষ্টি ক জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং কুড়মি ও কড়া দ্রাবিড়ীয়। এরাই সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা। এখানে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া যায় যে এদের মধ্যে কোন জনগোষ্ঠী উক্ত সভ্যতা গমনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল অথবা উক্ত ভূখন্ডে সর্ব্বাগ্রে বসতি স্থাপন করেছিল। ভাষাবিদগণ, ইতিহাসবিদগণ, আজও পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। কারণ সিন্ধু সভ্যতা বিষয়ে গবেষণা লব্ধ মৃৎ পাত্রে, শিলালিপিতে লিখিত ভাষা পাঠোদ্ধারে ব্যর্থতা। তাই যদি বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ভূখন্ডের পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, প্রাচীন জনপদের নামের ভাষা বিচারে কি উক্ত ব্যর্থতা দূর করা যাবে না? নামকরণ করার ভাষাও তো তাদেরই ভাষার কথ্যরূপ। এ যুক্তি যদি বিজ্ঞান সম্মত বিবেচিত হয় তাহলে নামকরণের ভাষা বিষয়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভাষাবিদগণের অভিমত অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের ভাষা অস্ট্রীক ভাষা পরিবারের ভাষা এবং কড়া ও কুড়মির ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষা পরিবারের ভাষা। অর্থাৎ কড়ার ভাষা কুড়ুক এবং কুড়মির ভাষা কুড়মালি ভাষা দ্বয় দ্রাবিড়ীয় ভাষা পরিবারের ভাষা। নামকরণ করার ক্ষেত্রে নামকরণের ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ যে বা যারা যে ভূখন্ডে সর্ব্বাগ্রে বসতি স্থাপন করে সে বা তারা উক্ত ভূখন্ডে অবস্থিত পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালাকে জানা চেনার প্রয়োজন বোধ করে তাই তারা সেগুলোর নিজ মাতৃভাষাতে নামকরণ করে। অতএব নামের ভাষা জনগোষ্ঠীর পরিচয় অবশ্যই দিতে সক্ষম। সিন্ধু নদীর উপত্যকা এবং আববাহিকা অঞ্চলে যে সব পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা এবং প্রাচীন জনপদ পুরাকালীন নামের পরিচয় নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে বর্ত্তমানেও সক্ষম আছে অন্তত সেই সব নামের ভাষা নির্ধারিণ করা উচিত। সিন্ধু নদী :- সিঁদ এবং বু শব্দ দ্বয়ের সমন্বয়ে সিঁদুর শব্দটি সৃষ্ট। সিঁদ শব্দে কুড়মালি ভাষাতে সরুগর্ত বুঝায়। সহজবোধ্য করার জন্য বলি সিঁদকাটা, সিঁদেল চোর ইত্যাদি। বু সব্দে জল বুঝায়। অর্থাৎ সরু গর্তে প্রবাহিত জল ধারাতে সৃষ্ট নদীকে আদিতে সিঁদুবু নদী নামে নামকরণ করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে সিঁদবু শব্দটি সিন্ধু শব্দে রপান্তর ঘটে এবং সিন্ধু নামে প্রচারিত হয়। দ্রাবিড় :- দ এবং বিড়া শব্দ দুটির সংযুক্তিতে দবিড়া শব্দটি গঠিত হয়। দ শব্দে কুড়মালি ভাষাতে নদীর জলস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়াকালে তৈরি ঘূর্নি দ্বারা সৃষ্ট বিশাল বাঁধ বুঝায়। বিড়া শব্দে কুড়মালি ভাষাতে কুঁবা-কুড়িআ বুঝায়। সহজ বোধ্য করার জন্য বাক্যে প্রয়োগ করে দেখানেতে বলা হয় - অঁই বিড়-টিড়হা উঠা উলাক। যাই হোক বিড়া

শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ কুঁড়েঘর । তৎসূত্রে দবিড়া শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ নদীর মধ্যে সৃষ্ট বিশাল বাঁধ উপকূলে কুড়ে ঘর বিশিষ্ট জনপদ।

আদিকালের দবিড়া শব্দ থেকে দবিড় শব্দের উদ্ভব হয়। কালক্রমে দবিড় শব্দের ও উচ্চারণের হেরফেরে দ্রবিড় শব্দে রূপান্তর ঘটে। দ্রবিড় শব্দ থেকেই দ্রাবিড় শব্দের সৃষ্টি হয়। উক্ত দ্রাবিড় শব্দের সাথে কুড়মালি ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট তাতে আপ্রত্যয় যোগে প্রথমে দ্রাবিড়িআ বা দ্রাবিড়ীয়া শব্দে রূপান্তর ঘটে যার অর্থ দ উপকূলে কুঁড়ে ঘরে বসবাসকারী। পরবর্ত্তীকালে দ্রাবিড়ীয়া শব্দটিকে শ্রুতিমধুর এবং উচ্চারণে সহজ করার জন্য দ্রাবিড়ীয় শব্দে রূপান্তর ঘটানো হয়।

কড়মালি সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক গিতে প্রাপ্ত কুড়ম পাহাড ঃ- কুড়ম শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ যার বাংলা ভাষাতে অর্থ কচ্ছপ। কুড়মের অর্থাৎ কচ্ছপের মত আকৃতির অর্থাৎ কুড়ম সদৃশ পাহাড়কে কুড়ম পাহাড় নামে নামকরণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তদ্রুপ কুড়ম নদী ঃ- কুড়মের আবাসস্থল থাকার মত প্রাকৃতি পরিবেশ থাকা অর্থাৎ কুড়মের প্রাচুর্যতা থাকা নদীর নাম কুড়ম নদী। অনুরূপ সাঁখ নদী ঃ- সাঁখ শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ যার বাংলা ভাষাতে অর্থ শঙ্খ। সাঁখের অর্থাৎ শঙ্খের প্রাচুর্যতা থাকা নদীর নাম সাঁখ নদী। পরবর্ত্তীকালে সাঁখ নদী নামের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং সাইঅক নদী নামে পরিচিত হয়। মহেঞ্জোদড়ো ঃ- এই শব্দটি কুড়মালি ভাষার ১) মুহাইন ২) জড়ন ৩) দ ৪) আড়ো এই চারটি শব্দের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে। ১) মুহাইন শব্দটীর কুড়মালি ভাষাতে অর্থ পেইন বা পইন যার বাংলা ভাষাতে অর্থ বাঁধের অতিরিক্ত জল নিষ্কাসনের নালা ২) জড়ন শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ সন্ধিস্থল ৩) দ শব্দের অর্থ উল্লিখিত হয়েছে ৪) আড়ো শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ বসতি অর্থাৎ জনপদ। সম্যক মুহাইন -জড়ন- দ- আড়ো শব্দগুলির একত্রে সংযুক্তিতে গঠিত হয়েছে মহেঞ্জোদড় শব্দটি যার বাংলা ভাষাতে অর্থ বাঁধের অতিরিক্ত জল নিষ্কাসনের সন্ধিস্থলের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বসতি বা জনপদ। হরপ্পা ঃ- হরপ্পা শব্দটী কুড়মালি ভাষার হর এবং রপা শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। কুড়মালি ভাষার হর শব্দটি হ এবং র শব্দদ্বয় দ্বারা সৃষ্ট। হয়তো ভাবছেন, হ এবং র এগুলো তো শব্দ নয়, এগুলো একেকটি অক্ষর। কুড়মালি ভাষার এটা একটা নিজস্ব স্বকিয়তা, এই ভাষাতে অধিকাংশ অক্ষর এককভাবে একেকটি শব্দের অর্থ প্রকাশ করো। এক্ষেত্রে হ শব্দে কৃষিকর্ম্মে সহায়ক গবাদি পশুকে শান্ত করা এবং থামানো অর্থ প্রকাশ করে। র শব্দে মানুষকে শান্ত করা এবং অপেক্ষা করার অর্থ প্রকাশ করে। যে যুগে কুড়মি জাতির মানুষ আরণ্যক জীবনযাপনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে কৃষিকর্মের দ্বারা একক প্রচেষ্টাতে উদর পূরণের খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করে সেই যুগ সন্ধিক্ষণে কুড়মি জাতির আরাধ্য দেবতা বুড়হাবাবা অন্যের শিব ঠাকুর হ শব্দে আরণ্যক গবাদি পশুকে শান্ত করে তদ্রুপ র শব্দে কুড়মি জাতিকে শান্ত করেন এবং উভয়ের মিল ঘটান। উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি সাধন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বুড়হাবাবা কুড়মি জাতিকে গবাদি পশু আশীর্ব্বাদ স্বরূপ দান করেন। তাই তো তিনি কুড়মির গোয়াল ঘরে গঠ-রইআগরইয়া ঠাকুর রূপে

বিরাজমান, পূজিত হন। তাই তো তিনি কৃষিঅধিষ্ঠাতা দেবতা। কুড়মি জাতিকে গবাদি পশু প্রদান করার আধারে তারা তাদের বুড়হাবাবার কর্মানুসারে হর নামে নামকরণ করে। এক কথায় হর মানে কুড়মির বুড়হাবাবা অন্যের শিব ঠাকুর। রপাশব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ বপন করা বা প্রতিষ্ঠাপন। তৎসূত্রে সম্যক হর-রপা থেকে সৃষ্ট হরপ্পা শব্দের বাংলা ভাষাতে শাব্দিক অর্থ হর এর প্রতিষ্ঠাপনা উদ্ধৃত হয়েছে হর হচ্ছেন কৃষি সহায়ক গবাদি পশু প্রদানকারী এবং কৃষি অধিষ্ঠাতা দেবতা। দেবতাকে প্রতিষ্ঠাপনের অর্থ তার কৃপা প্রার্থনা করা। এক্ষেত্রে যেহেতু হর গবাদি পশু প্রদানকারী এবং কৃষিঅধিষ্ঠাতা দেবতা তাই তাঁর কৃপাতে পশুর সুস্থতা এবং কৃষিকর্মে সফলতা প্রার্থনা করাই স্বাভাবিক। অতএব যে এলাকার মানুষ হরকে প্রতিষ্ঠাপনের মাধ্যমে কৃষিকর্ম পেশাতে সুখে - স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করত, সেই এলাকাকে হরপ্পা নামে নামকরণ করেছিল।

এইভাবে যে ভূখন্ডের আনাচেকানাচে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই ভূখন্ডের সমস্ত পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, প্রাচীন জনপদের প্রাচীন নামের শব্দের বুৎপত্তি গবেষণা মূলক অনুসন্ধানে জানা যাবে সমস্ত নামের শব্দ কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ নামের পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কুরম পাহাড়, কুরম নদী, শাইয়ক নদী, সরস্বতী নদী, তক্ষশীলা ইত্যাদি।

আফ্রিকার ঘনজঙ্গল থেকে স্থানান্তরণকালে কুড়মি জাতির দলটি সমুদ্রে পরিবেষ্ঠিত এই ভূখন্ডে এসে পৌঁছয় তখন তারা নিজ মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষাতে এবং নামকরণ করার নিজ পদ্ধতিতে সমুদ্রে পরিবেষ্ঠিত এই ভূখন্ডের নাম জামবুদিপ নামে নামকরণ করে। জামবুদিপ শব্দটি কুড়মালি ভাষার ১) জাম ২) বু এবং ৩) দিপ শব্দত্রয় থেকে সৃষ্ট। জাম শব্দের অর্থ জামফল, বু শব্দের অর্থ জল এবং দিপ শব্দে জলে পরিবেষ্ঠিত ভূখন্ডকে বুঝায়। পাকা জামফলের রসের রঙ নীলাভ। সমুদ্রের জলের রঙ নীলাভ। পাকা জাম ফলের রসের রঙের সাথে সমুদ্রের জলের সাদৃশ্য থাকার কারণে যে দিপ পাকা জাম ফলের রসের রঙের জল দ্বারা পরিবেষ্ঠিত সেই ভূখন্ডকে জামবুদিপ নামে নামকরণ করেছিল। হয় তো এমনও হতে পারে অন্যান্য সমুদ্রের জলের রঙ নীলাভ নয়। তাই নীলাভ রঙের জলের সমুদ্রে পরিবেষ্ঠিত ভূখন্ডকে জামবুদিপ নামে নামকরণ করেছিল। জামুবুদিপ নামের পূর্বে অন্যান্য কোনও নামের ইতিহাস অথবা তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নাই। এরপর ভারত বা ভারতবর্ষ নামের কাহিনী শোনা যায়। যাই হোক উক্ত ভূখন্ডের যে এলাকাতে উক্ত দলটি প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল সেই এলাকার মাটি মেহাল মাটি ছিল। মেহাল শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ যার বাংলা ভাষাতে অর্থ সামান্য আদ্র। মাটির চরিত্র বিচার করে উক্ত এলাকাকে মেহাল গড় নামে নামকরণ করেছিল। বর্তমানে মেহালগড় নামের পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং মেহরগড় নামের প্রচলন হয়েছে। মেহাল মাটি কৃষি উপযোগী মাটি তাই তারা মেহালগড়ে বসবাস করা কালেই কৃষি কর্ম্মের সূচনা করেছিল।

জামবুদিপের অর্থাৎ ভারত ভূখন্ডের যে অংশে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই অংশের স্থানের প্রাচীন নামের ভাষা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কুড়মি জাতির আদিমতা তথ্য সাধ্যমত পরিবেশন করা হল। যেহেতু সিন্ধু সভ্যতা কৃষি আধারিত সভ্যতা তাই কৃষি কর্মের গোড়াপত্তনের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। প্রথমতঃ কুড়মালি সংস্কৃতিতে বারো মাসে যে তেরো পরব অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি কৃষিকর্ম আধারিত কি না তা যাঁচাই করা প্রয়োজন। কারণ জীবন এবং জীবিকা নির্বাহের পথ অবলম্বন করে নিজ মাতৃভাষাতে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কুড়মি জাতির জীবন নির্বাহের পথ তন্ত্র ধর্ম এবং এবং জীবিকা নির্বাহের পথ কৃষিকর্ম। পরবের মাধ্যমে কৃষিজীবি কুড়মি জাতি কৃষি কর্মের পদ্ধতি যুগ পরম্পরা জিইয়ে রাখার কল্পনা থেকেই পরবগুলির সৃষ্টি এবং মেনে চলা। যার কারণে দেখা যায়, পরবগুলিতে দেব-দেবীর আরাধনা-উপসনা করার নিয়ম-নীতির প্রচলন প্রচলিত নাই। উদাহরণ -

১।। আখাইন জাত-রা—

শস্য অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্য্যদেব মাঘ মাসের প্রথম দিবসে উত্তরায়নে গম আরম্ভ করেন। সর্য্য দেবের উত্তরায়ণে অবস্থানকাল ব্যতিরেকে অন্য সময়ে মনুষ্য জাতির উদর পুরনের প্রধান শস্য ধান দানার প্রাকৃতিক উপায়ে অঙ্কুর উদ্গাম করার ক্ষমতা থাকে না। তাই কৃষক কুড়মি জাতি সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণকে শুভ বিবেচনা করে "হার পুন্থা" পরব মানার মাধ্যমে কৃষি কর্মের সূচনা করে। কুড়মালি সংস্কৃতি ছয় মাসের বর্ষগননা মত পোষণ করে। এই গননা পদ্ধতিতে মাঘ মাসকে বৎসের প্রথম মাস এবং জাড় মাস অর্থাৎ পৌষ মাসকে অন্তিম বলা হয়। তাই মাঘ মাসের প্রথম দিবস, সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণে গমনের আরম্ভ দিবস এবং কর্ম আরম্ভের প্রথম দিবসটি কুড়মি জাতির অত্যন্ত শুভ দিবস। আখা শব্দের অর্থ কুড়মালি ভাষাতে চুলহা এবং বাংলা ভাষাতে উনান। রান্না করা কালে চুলহাতে যেভাবে অহরহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে তদ্রুপ সূর্যের মধ্যেও অগ্নি অহরহ প্রজ্জ্বলিত হয়ে চলেচে। তাই তো চুলহার মতো সূর্য্য থেকে আলো এবং তাপ পাওয়া যায়। চুলহার সাথে সূর্যের সদৃশ্যগত মিল থাকার কারণে সূর্যকে আখা কল্পনা করা হয়েছে। জাত শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ যাবে বা যাইবে। রা শব্দের অর্থ বিশ্বচরাচর। এক্ষনে আখাইন জাত-রা শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ সূর্যদেব বিশ্ব চরাচরে যাবে অর্থাৎ দক্ষিনায়ণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে উত্তরায়নে যাওয়া শুরু করবে। অর্থাৎ ধান শস্যদানা অঙ্কুর উদ্গমনের অনুকুল আলোক রশ্মি পাবে। তাই তো কৃষিজীবি কুড়মি জাতি আনন্দে আত্মহারা হয়ে কৃষিকর্মের সূচনা করে থাকে।

২।। চড়ক পূজা—

শস্যাধিষ্ঠাতাদেবতা সূর্য্য দেবের উত্তরায়ণে অবস্থানকালে তাঁর কিরণ রশ্মির

প্রতিক্রিয়াতে ক্ষিতি, অপ, মরুৎ এবং ব্যোম এই চার ভূত ও সময় অনুসারে উদ্ভিদ সৃজনে সৃজনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। কুড়মি জাতি আবহমান কাল থেকে, বর্ত্তমান কালের বর্ষ গণনা মতে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটিতে কোনো কোনো এলাকাতে তেলে হলুদ কোনো কোনো এলাকাতে বুড়হাবাবার নরতা অনুষ্ঠান পালন করে এবং চৈত্র মাসের ষোড়শ দিবসে বুড়হাবাবার মড়পে (মন্ডপে) ঢাকের বাজনা বাজিয়ে ধুমইল দেওয়ার মাধ্যমে জন্ম দিবস পালন করা হয়। স্বয়ং কৃষি অধিষ্ঠাতা দেবতার জন্ম জনিত কারণের অশৌচ সৃষ্ট অশূচিতা হেতু আগামী বৎসর বীজবপন করার উদেশ্যে সংরক্ষিত বীজের অঙ্কুর উগ্দম গুণ পরীক্ষা করার কল্পনা থেকেই চড়ক পূজার সৃষ্টি। চড়ক শব্দটি কুড়মালি ভাষার চড়কা শব্দ থেকে সৃষ্ট। চড়কা শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ সাদা। বীজ যে রঙেরই হোক সকল বীজের অঙ্কুর হয় সাদা। চড়ক পূজার মাধ্যমে কৃষিজীবি কুড়মি জাতি আগামী মরসুমে কৃষি কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্য শস্যদানা ধান চাষ করার জন্য সংরক্ষিত বীজর অঙ্কুর উদ্‌গম করা গুনে গুনসম্পন্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে এবং বীজ শোধন করে। কুড়মি জাতি চারদিন ব্যাপী চড়ক পূজা অনুষ্ঠান করে। যথা- ১। ফলহার ২। উপাস ৩। পৈঠা ৪। বুড়হাবাবার নারতা। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে করনীয় কর্ম্ম করা আধারিত অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। যেমন-

১। ফলার ঃ- আদিতে চতুর্থ দিবসীয় চড়ক পূজা কুড়মালি সংস্কৃতির কৃষি আধারিত অনুষ্ঠানমূলক সংস্কংতি বিভাগে সংযোজিত হওয়া কালে শব্দটি ছিল ফলাঅর। পরবর্তী যুগে আগ্রাসনে আগ্রাসিত হয়ে কুড়মালি ভাষার স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্টতার বিলোপ ঘটিয়ে শব্দটিকে ফলার শব্দে রূপান্তরিত করে প্রচলিত করা হয়। বর্তমানকালে ফলার শব্দটিরও পরিবর্তন ঘটিয়ে ফলআহার শব্দের প্রচলন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যার সাথে কুড়মালি সংস্কৃতির ফলাঅর দিনে করনীয় কোন কর্মের সামঞ্জস্যতা বা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলাঅর শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। কুড়মালি ভাষাতে ফলা শব্দের অর্থ পাল খাওয়া বা যৌনমিলনে মিলিত হওয়া। অর শব্দের অর্থ উৎস। তন্ত্রসাধন পথাবলম্বী কুড়মি জাতি অবগত ছিল নারী জাতির ঋতুস্নান হওয়া যৌন মিলনের উৎস। কুড়মি জাতি ফলাঅর অনুষ্ঠানে চলতি মরশুমে উৎপাদিত কাঁচা ছোলার ডাল, কুন্থ বা আঁঠি সৃজিত হয়নি এরূপ কচি আম এবং কাঁঠালের টুকরোকে কাঁচা গুড়ের সাথে মিশিয়ে প্রসাদ তৈরি করে এবং সেই প্রসাদ বুড়হাবাবাকে অর্পন করে। এই দিনে বুড়হাবাবার ব্রতী অর্থাৎ ভগতাগনের অনুপ্রবেশ ঘটে। ভগতা শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। ভগা শব্দের অর্থ লজ্জা নিবারনের জন্য এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র বা কপিন। যারা ভগা পরিধান করে তন্ত্র সাধনার নানাবিধ মুদ্রা এবং সিদ্ধিযোগ আচরন করে এবং বুড়হাবাবার মন্ডপে অবস্থান করে থাকে তাদেরকর ভগতা বলা হয়। ঘরদোর পরিত্যাগ করে ফলাঅর দিন থেকে বুড়হাবাবার নারতা দিন পর্যন্ত এদেরকে বুড়হাবাবার মন্ডপে পড়ে থাকতে হয়।

২। উপাস ঃ- উপাস শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। উ কার অক্ষরটি তন্ত্র সাধন পথে সৃষ্টি অর্থ প্রকাশ করে। পাস শব্দটির অর্থ সন্নিকট। সামগ্রিক অর্থ সৃষ্টি সন্নিকট। জাতাশৌচ বীজের অঙ্কুর উদ্‌গমনে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি প্রমাণ পাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা

তন্ত্রসাধনার নানাবিধ মুদ্রা এবং সিদ্ধিযোগের করা করণ আচরণ করার মাধ্যমে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য করে থাকে। এই নৃত্যের তারা নামকরণ করেছিল ছঁ-নাচ। ছঁ নাচ শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। এর বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ দূরে সরা। চড়ক পূজাতে জাতাশৌচ দূরে সরে যাওয়ার আনন্দে যে নাচ হয় সেই নাচকে ছঁ নাচ বলা হয়। বর্তমানে কুড়মালি ভাষার ছঁ শব্দটির বিলোপ ঘটিয়ে ছঁ নৃত্য নামকরণ করা হয়েছে। অতীতে ছঁ নাচ নাচার একটি সময় সীমা বাঁধা ছিল। ছঁ নাচ নাচা শুরু হত চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব দিবসে এবং পরিসমাপ্তি ঘটত জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন। অর্থাৎ রাজাসলহার দিন। উপাস দিনের রাত্রিতে ছঁ নাচ নাচার শুরু। পরদিনটিকে বলা হয় পইঠা বা পৈঠা। (৩) পইঠা ঃ- পইঠা অনুষ্ঠানে সকালবেলা বুড়াবাবাকে পাঁঠা বলির রক্ত প্রসাদ অর্পন করা হয়। রক্ত উর্বরতার প্রতীক। উপাস অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেছে সৃষ্টি অর্থাৎ বীজের অঙ্কুর সন্নিকট অতএব অঙ্কুরের উর্বরতা প্রয়োজন। তাই পাঁঠা বলিদান দেওয়ার মাধ্যমে অঙ্কুরের প্রয়োজনীয় উর্বরতা মেটানো হয়। এই দিন কৃষিজীবি কুড়মি জাতি আগামী মরশুমে চাষ করার জন্য ঘরে সংরক্ষিত শাক-সবজির দানিতে বুঢ়াবাবার মড়পে নিয়ে যায় এবং মড়পে ধুলা মাটি মাখিয়ে ঘরে নিয়ে আসে। যথা সময়ে বীজ বপন করে। এই দিন কৃষিজীবি কুড়মি জাতি তাদের পূর্ব পুরুষদের খুড়হা বা ছাতুর বাৎসরিক পিন্ড দান করে এই কারণে দিনটি খুড়হা খাওয়া দিন নামে পরিচিত। এই দিনটি ভগতাঘুরা দিন নামেও পরিচিত। এই দিনটিতে ভগতাগণ তন্ত্র সাধনার সিদ্ধিযোগের মাধ্যমে শূন্যে অবস্থান করে এবং বুড়াবাবার চারদিকে ঘুরতে থাকে। (৪) বুড়হাবাবার নারতা ঃ- জন্ম হলেই নারতা বা নারতা অনুষ্ঠান পালন করা ধর্মীয় বিধি। ১লা বৈশাখ ভগতাগণ পুকুরপাড়ে স্নানের ঘাটে তেল হলুদের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালন করে। মোদ্দা কথা চড়ক পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুড়মি জাতি বীজ শোধন করে। কুড়মি সমাজে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে, সারনা ধর্মে বুড়হাবাবাকে আরাধনা, উপাসনা করার নিয়ম-নীতি-সংস্কার সর্বত্রই, কৃষি কর্মের সাথে জড়িত আছে। তাই বুড়হাবাবার পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন। সৃষ্টিকাল থেকেই জীবজগতকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন অরণ্যে দাবানল, নদীতটে বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, সমতলে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হতো এবং মোকাবিলা করতে হতো। ভয় ও ত্রাসের মধ্যে মনুষ্য সমাজের একটি দলের মানুষের মনের মধ্যে প্রকটিত হয়েছিল এক সর্বশক্তিমান মহামানবের অস্তিত্বের চেতনা। সেই চেতনার ক্রমবিকাশে পরিণত মননক্রমে তারা অনুভব করেছিল সেই অদৃশ্য সত্তার আরো একটি পরিচয় আছে। ধ্বংসের অদৃষ্ট নিয়ন্তার কর্মধারার বাহ্যিক প্রকাশের অন্তরালেই রয়েছে নূতন সৃষ্টির উদ্বোধন প্রক্রিয়া অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টির বীজ। সুতরাং ধ্বংস ও সৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রলয়ের উৎস যিনি, সৃষ্টির উৎস ও অলক্ষ্যে অবশ্য তিনি। তাই সৃষ্টি ও ধ্বংস তার দ্বারাই হয়ে থাকে। সেই সর্বশক্তিমান মহামানবের অস্তিত্বকে তারা সৃষ্টির আদি কল্পনা করেছিল। সৃষ্টির আদি যিনি তিনি বুড়হাবাবা। মনুষ্য সমাজের যে দলটির চেতনার ক্রমবিকাশে পরিণত মনন ক্রমে সৃষ্টির আদিকে বুড়হাবাবা কল্পনা করেছিল, পরবর্ত্তীকালে স্থানান্তরণ করতে থাকাতে সেই দলটি নীলাভ জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূখন্ডে এসে পৌঁছায়।

তারা নিজ মাতৃভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দে সেই ভূখন্ডকে জাম-বু দিপ নামে নামকরণ করে। উক্ত জাব-বু দিপের কুড়ম পাহাড়ের পাদদেশে, কুড়ম নদীর অববাহিকা এলাকাতে বসবাস করাকালে এদের কুড়মি নামের প্রচলন ঘটে। কৃষিকর্মের উদ্ভাবন অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কৃষি অধিষ্ঠাতা দেবতা কুড়মির বুড়হাবাবা প্রসঙ্গে আলোচনা করাটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। তথাপি উক্ত আলোচনা অত্রস্থলে সমাপ্ত করে পরবগুলি ধারাবাহিক নাম এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষিকর্মের সাথে সংযুক্ত থাকার প্রমাণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করি।

৩।। রহিন—

পঞ্চভূতে জীবের সৃষ্টি। কিন্তু শস্যাধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্য্যদেবের উত্তরায়নে অবস্থানকালে মনুষ্যজাতির উদর পূরণের প্রধান শস্যধান দানা অঙ্কুরিত হওয়ার পর্যাপ্ত পরিমানের জলের অভাব থাকে। আবহাওয়া বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানবান কুড়মি অনুধাবন করেছিল বর্তমান বর্ষ গণনা পদ্ধতির জৈষ্ঠ্য মাসের তেরো তারিখ অথবা তার সাতদিন পূর্বে অথবা পরে মৌসুমী বায়ুর আগমন ঘটে এবং বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তাই কুড়মি জাতি জৈষ্ঠ্য মাসের তেরো তারিখে বীজ বপন করা কর্মের সূচনা করে। রহন শব্দ থেকে রহিন শব্দটির সৃষ্টি। কুড়মালি ভাষার রহন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল গর্ভ সঞ্চার। যেহেতু বীজের গর্ভসঞ্চার ঘটেছে তাই তাকে পঞ্চভূতের সংস্পর্শে রাখা প্রয়োজন। পঞ্চভূতের সংস্পর্শে রাখার উদ্দেশ্যে রহিন দিন কুড়মি জাতির মানুষজন বীজ বুনা কর্মের সূচনা করে থাকে।

৪।। রাজাসলহা—

ক্রিয়ামূলক তন্ত্র ধর্মের ক্রিয়ার মাধ্যমে কুড়মি জাতি জীব সৃষ্টির উৎস পথের সন্ধান অবগত হয়েছিল। তারা জানতে পেরেছিল পুরুষ ও প্রকৃতির যৌনমিলনে মিলিত হওয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। রাজা শব্দে কুড়মালি সমাজে ভূস্বামী বোঝায় না, কুড়মি সমাজে রাজা শব্দে ডিমের রাজা, চোখের রাজা এবং স্ত্রী জাতির স্বামী রাজা বোঝায়। সলহা শব্দে মিলন অর্থ প্রকাশ করে। সামগ্রিক ভাবে রাজাসলহা শব্দে পুরুষপ্রকৃতির মিলন অর্থ প্রকাশ করে।

৫।। জাতাড়—

আযাঢ় মাসের মধ্যে উদর পুরনের প্রধান শস্য ধানের চারাগাছ কৃষি জমিতে রোপন করার যোগ্য হয়ে ওঠে। তাই কৃষক কুড়মি জাতি শ্রাবণ মাসের শুরু থেকে রোপন করা কাজ শুরু করে। সেই উপলক্ষ্যে আযাঢ় মাস থেকে কৃষি জমি তৈরী করার কাজ শুরু করার পূর্বে কৃষি আধারিত কুড়মালি সংস্কৃতির অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতিতে আযাঢ় মাসের মধ্যে জাঁতাড় পুজা সম্পন্ন করে থাকে। আমার অনুমান হাজার হাজার বৎসর পূর্বে সে সময়কালে কৃষিজীবি কুড়মি জাতি কৃষি কর্ম্ম আধারিত কুড়মালি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল সেই সময়কালে তারা

জতার শব্দটি প্রয়োগ করেছিল। কুড়মালি ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট কর্ত্তাকে উহ্য রেখে ক্রিয়ার মাধ্যমে কর্ত্তার পরিচয় লাভ করা। যেমন- আউএইসাহে, আউএইসাহি। আউএই সাহে ক্রিয়ার কর্ত্তা নিশ্চিতভাবে পুংলিঙ্গ বাচক হবে এবং আউ এইসাহি ক্রিয়ার কর্ত্তা নিশ্চিতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হবে। তদ্রুপ জতা শব্দের সাথে হার শব্দটি অবশ্য সংযোতি হয়ে হার জতা অর্থাৎ লাঙ্গল চসা হবে। এতৎ সূত্রে জতার শব্দের জতা শব্দটি অবশ্যই হার জতার অর্থ প্রকাশ করে। জাঁতাড় পূজা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চারাগাছ রোপন করার জন্য কৃষি জমি তৈরী করার কাজ শুরু করা নিষেধ মানা হয়। জতা এবং অর। জতা মাতে লাঙল চযা অর শব্দটি সূত্র, শুরু এক্ষেত্রে অর্থ প্রকাশ করে। সামগ্রিক জতার অর শব্দটি লাঙলচষা অর্থ প্রকাশ করে। সামগ্রিক জতার শব্দের অর্থ হারজতা উচরণ (লাঙ্গল চসা শুরু) পরবর্ত্তীকালে জতার শব্দটি জাঁতাড় শব্দে রূপান্তরিত হয়।

রূপান্তরণের সূত্র ঃ- কুড়মালি ভাষা নাসিক্য উচ্চারণ বিশিষ্ট ভাষা এতএব জতা শব্দটি জঁতা শব্দে রূপান্তরিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অর শব্দটির র অক্ষরটি ড় অক্ষরে রূপান্তরিত হওয়া ব্যায়াকরণগত বিচারে শুদ্ধ। কৃষিজীবি কুড়মি জাতি প্রতি বৎসর আখাইন- জাত-রা দিন আড়হাই পাকহার জতি (আড়াই পাকলাঙ্গন চসে) সামগ্রিক কৃষি কর্মের সূচনা করে। শ্রাবণ মাসে কচি ধান চারা গাছ রোপন করার জন্য কৃষি জমি তৈরী করার প্রয়োজন পড়ে। জমি তৈরী করার একমাত্র উপায় কৃষি জমিতে লাঙ্গল চষা। অর্থাৎ পৃথিবী মাতাকে কর্ষণ করা। কচি ধান চারা গাছ রোপন করা অর্থাৎ পৃথিবী মাতার কোলে চড়ানো। তাই কৃষক কুড়মি জাতি কৃষি কর্মে সাফল্য লাভের কামনার্থে জাঁতাড় পরবের মাধ্যমে পৃথিবী মাতার কুড়মালি ভাষাতে মাঁহাঁমাই এর পূজা সম্পন্ন না করে কৃষি জমিতে লাঙ্গল চষা অপরাধ বোধ করে। তাই তারা আষাঢ় মাসের মধ্যে জাঁতাড় পূজা সংস্কার পালন করে।

মাত্রামাফিক এবং সময়ে মিলন ব্যতীরেকে জীব সৃষ্টি অসম্ভব। তাই শ্রাবণের অতিবর্ষণ শুরুর পূর্বে জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করেছিল এবং উক্ত দিবসটিকে রাজাসলহা নামে চিহ্নিত করেছিল। অঙ্কুর উদ্গামের প্রয়োজন মাফিক জেষ্ঠ্যের বর্ষনে, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে বপন করা শস্য বীজ অবশ্যই অঙ্কুরিত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাসে কুড়মি জাতি মহানন্দে উক্ত দিবসে উৎসব পালন করে এবং কৃষিকর্ম থেকে বিরত থাকে।

৬।। আঁবাবতি—

কুড়মালি সংস্কৃতিতে মাসের দিন গণনাতে অষ্টম দিবসটি ও সংক্রান্তি দিবসটি এবং তিথি গণনাতে অষ্টমী তিথিটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ দিবস ও তিথি। যেহেতু জৈষ্ঠ্য মাসের মহত্বপূর্ণ সংক্রান্তিতে প্রকৃতিও পুরুষের অর্থাৎ হরি ও হরের মিলন ঘটে তাই বপন করা সমস্ত শস্য বীজ সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে অবশ্যই অঙ্কুর উদগমে সক্ষম হয় এবং আষাঢ় মাসের অষ্টম দিবসের মধ্যে নব পল্লবে পল্লবিত হয়। কচি চারা গাছ নব পল্লবে পল্লবিত হওয়াতে প্রকৃতি মাতা

হেরিহর অর্থাৎ সবুজে সবুজময়ের সৌন্দর্যে সুন্দরী হয়। হেরিহরের সৌন্দর্যের সুন্দরী হয়ে উঠাটাকে কুড়মালি ভাষাতে "আঁবাবতি" বলা হয়। তাই আষাঢ় মাসের অষ্টম দিবসটিতে কৃষি স্রষ্টা কৃষক কুড়মি জাতি বীজ বপনের সাফল্য লাভের আনন্দে আনন্দিত হয়ে উৎসব পালন করে এবং কৃষিকর্মে বিরত থাকে।

৭।। করম পরব—

ভাদ্র মাসের চাঁদের শুক্ল পক্ষীয় একাদশী তিথিতে কুড়মালি সংস্কৃতিতে করম পরব পালন কবা হয়। উক্ত সময়সীমা কালে রোপন করা ধান চারা গাছ কিশোর বয়স প্রাপ্ত হয়। তন্ত্র ধর্মাবলম্বী কৃষক কুড়মি জাতির চিন্তনে এই বয়সের ধান গাছকে শস্য দানা উৎপাদনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সমীচিন চিন্তা করেছিল। কারণ ধান গাছ যদি জ্ঞানের অভাবে শস্য দানা উৎপাদনে অক্ষম হয় তাহলে তাদের সমুহ বিপদের আশঙ্কা মনে দেখা দিয়েছিল। অথচ ধান গাছকে সরাসরি সেই জ্ঞানে জ্ঞানবান করার উপায় নাই। তাই তারা চিন্তা করেছিল তাদের নিজেদের বংশবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অর্থাৎ নব মানব শিশু সৃষ্টি করার জন্য অর্থাৎ কন্যাকে মাতৃত্ব লাভ করানোর জন্য কিশোর বয়সে পুত্র-কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। যেহেতু মানুষ মননশীল, সমাজবদ্ধ, সচেতন জীব তাই তারা অগ্রজদের নিকট বহু বিষয়ে বহু শিক্ষা লাভ করে এবং জীবনে সাফল্য লাভ করে। স্বীয় কন্যা তার আর্জি অর্থাৎ পিতার মাতা, দুধু মা অর্থাৎ মাতার মাতা, ভউজাই অর্থাৎ বৌদি সম্পর্কিয়া রমনী-কূলের নিকট মাতৃত্ব লাভের জন্য ঋতু স্নানকালের আচরণ থেকে শুরু করে নবজাত শিশুর পরিচর্যা করার সমস্ত নিয়ম, নীতি,পদ্ধতি করায়ত্ব করে। যেহেতু সকল জীবের সৃষ্টির পথ এক এবং অভিন্ন। তাই কুড়মি জাতি তাদের নিজ কন্যা যাদের কিশোর বয়সে বিবাহ হয়েছে অথচ মাতৃত্ব লাভ করেনি। সেই শ্রেণীর কন্যা মাতৃত্ব লাভের সমস্ত নিয়ম, নীতি, পদ্ধতি নিজেরা আচরণ করে দেখানোর মাধ্যমে কিশোর বয়সের ধান গাছকে শস্য দানা উৎপাদনের জ্ঞানে জ্ঞানবান করার চিন্তা থেকে করম পরবের সৃষ্টি। কুড়মি জাতির করম পরব একাদশ সংখ্যা বিশিষ্ট পরব। যেমন- একাদশী তিথিতে করম পরব অনুষ্ঠিত হয়। একাদশ দিবসের জাউআ তোলা হয়। একাদশ শ্রেণীর শস্য দানির জাউআ তোলা হয়। যারা জাউআ তোলে তাদের একাদশটি নিয়ম পালন করতে হয় ইত্যাদি। তন্ত্র ধর্মাবলম্বী কুড়মি জাতি তন্ত্র ধর্মের ক্রিয়া সাধনের মাধ্যমে সর্বগুণ সম্পন্ন ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে একাদশের মহত্ব উপলব্ধি করেছিল। করম শব্দটি তর্কাতীতভাবে কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ কিন্তু ভাষা আধারিত অর্থের সাথে করম পরবে অবশ্য পালনীয় নিয়ম, নীতি, ক্রিয়া অর্থাৎ সঁজত দিনে পালনীয় নিয়ম, নীতি, ক্রিয়া থেকে শুরু করে পারনা দিনে গউরি পূজা সমাপনান্তে নির্দিষ্ট আহার্য বস্তু আহার করা পর্যন্ত সবকিছুর উৎস সন্ধানে জানা যায় সকল জীবের উৎকৃষ্ট ফসল ফলানো অর্থাৎ বংশ সৃষ্টি করার উৎস নির্দেশক অর্থ প্রকাশ করে যা ভাষাভিত্তিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই 'ক' কার 'র' কার এবং 'ম' কার এই তিন অক্ষরে গঠিত করম শব্দ।

তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে ক কার ব্রহ্মাযোনি বা মহাযোনি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। র কার তেজ সত্ব বা তেজ অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। ম কার ব্রহ্মা বা বিন্দু অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। সামগ্রিক ক কার যুক্ত র কার যুক্ত ম কার অক্ষর ত্রয়ের সংযুক্তিতে গঠিত করম শব্দের অর্থতেজ এবং ব্রহ্মাকে সমানুপাতিক হারে মাত্রামাফিক পরিমানে ক্রীয়াশীল অবস্থাতে ব্রহ্মাযোনিতে মিলন ঘটানো। এটাই হলো সৃষ্টির সূত্র। এতদ ব্যতীরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। এতএব করম শব্দের অর্থ সৃষ্টির সূত্র।

তন্ত্র সাধক, তন্ত্র ধর্মাবলম্বী, তান্ত্রিক কুড়মি জাতির মাতৃ ভাষা কুড়মালি ভাষাতে তন্ত্র সাধনার ক্রিয়া প্রকাশের প্রতীক অক্ষর ককার, রকার এবং ম কার অক্ষর ত্রয়ের সংযুক্তিতে গঠিত করম শব্দকে সংস্কৃতভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা জাত ভাষাকে মিলিয়ে-মিশিয়ে গুলিয়ে ফেলে করম শব্দের অর্থ অনেকে কর্ম বলে থাকেন। তাঁরা কুড়মি জাতির করম পরব পালন করার আসল উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। আগাগোড়া কৃষি কর্ম করার পদ্ধতি আধারে বিজ্ঞান সম্মতভাবে গঠিত কুড়মালি সংস্কৃতির মধ্যেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। বিচার্য বিষয় কর্ম শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ কিনা? কর্ম শব্দটি যুক্ত অক্ষর দিয়ে গঠিত তাই কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ হতে পারে না। তর্কের খতিরে ধরে নেওয়া যাক্ করম শব্দের সংস্কৃত ভাষাজাত বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ কর্ম। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আমি কর্ম্ম করিব বাক্যের কুড়মালি ভাষাতে অনুবাদ মঁই করম করম। এটা বিশুদ্ধ ? জ্ঞাতার্থে বলা যায় বাংলা ভাষার কর্ম শব্দের কুড়মালি ভাষাতে প্রতিশব্দ কাম। বাংলা ভাষার আমি কর্ম করির বাক্যে কুড়মালি ভাষাতে অনুবাদ মঁই কাম করম। করম পরব উপলক্ষ্যে যে করম শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটি তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে জীব দেহের গুণ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর দিয়ে গঠিত নাম পদ বাচক শব্দ। এছাড়াও কুড়মালি ভাষাতে কর ধাতুর করা ক্রিয়াপদকে করম শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন- উত্তম পুরুষ, এক বচন, ভবিষ্যৎকালে মঁই করম। যার বাংলা ভাষাতে অনুবাদ আমি করবো। এক্ষেত্রে করম শব্দটি ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়া পদে নামকরণ করা হয় না। দ্বিতীয়ত ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত করম শব্দের অর্থের আধারে করম পরবের নেগ-নেতি অর্থাৎ নিয়ম নীতি পালন করার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

বলা হয়েছে করম শব্দের অর্থ সৃষ্টির সূত্র। পুরুষ ও প্রকৃতি অর্থাৎ নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের মাধ্যমে দেহস্থ তেজ এবং ব্রহ্মকে সমানুপাতিক হারে মাত্রামাফিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল অবস্থাতে ব্রহ্ম যোনিতে মিলন ঘটানো ব্যতীরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। সকলেই জানে পঞ্চভূতে জীবের সৃষ্টি। প্রকৃতি মাতার কোলে অহরহ পঞ্চভূত বিরাজমান। তাহলে কি অহরহ সকল শ্রেণীর জীব সৃষ্টি হয়ে চলেছে? তা তো হয় না। তান্ত্রিক কুড়মি জাতি তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টির উৎস এবং সূত্র বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পেরেছিল পুরুষের ক্ষিতি, অপ এবং তেজের অর্ধেকাংশ এবং নারীর মরুৎ, ব্যোম এবং তেজের অর্ধেকাংশ যৌন মিলনের মাধ্যমে ব্রহ্মাযোনিতে মিলন ঘটানো পঞ্চভূতে জীবের সৃষ্টি। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন

আসা স্বাভাবিক যে নির্দিষ্ট কুড়মি জাতি সৃষ্টি তত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন বোধ কেন করেছিল ? উত্তর অতীব সরল, কৃষি স্রষ্টা, সর্ব্বাগ্রে কৃষি কর্মে জীবিকা নির্বাহিকারী কৃষক কুড়মি জাতির পেশা খাদ্য শস্য দানাকে অঙ্কুরিত করা থেকে শুরু করে পুনরায় শস্যদান ফলানো, পাকানো সমস্ত প্রক্রিয়া সৃষ্টিতত্ব বিষয়ক।

দ্বিতীয়ত কুড়মি জাতি নিজ মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষাতে প্রায়ই বলে থাকে "কিনা করম ভাই, মরকরম কাপাড়ে অহে রহি" বাক্যটির প্রথমাংশে ব্যবহৃত করম শব্দটি ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত হয়েছে যার বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ করবো। এবং দ্বিতীয়াংশে ব্যবহৃত করমশব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ ভাগ্যে। গোটা কুড়মালি বাক্যটির বঙ্গানুবাদ " কি করবো ভাই, আমার সৃষ্টি সূত্রে অর্থাৎ জন্মসূত্রে ভাগ্যে ওটাই ছিল"। এক্ষেত্রেও করম শব্দের অর্থ সৃষ্টি সূত্র। তান্ত্রিক কুড়মি জাতি তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টির সূত্র বিষয়ক বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান অর্জন করেছিল। উক্ত সূত্র বাস্তবায়িত করার উপায় নর ও নারীর যৌন মিলন। কৃষক কুড়মি জাতি কৃষিজ কিশোর বয়সের ধান গাছের যৌন মিলনের পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞান থাকা অসম্ভব চিন্তা করেছিল। অপরদিকে যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই কিশোর বয়সে বিবাহিতা মানবী কন্যা সমাজ থেকে নর-নারীর যৌন মিলন বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেয়ে থাকে এবং জ্ঞানবতী হয়ে উঠা বিশ্বাস করেছিল। সৃষ্টির সূত্র নর-নারীর যৌন মিলনের মাধ্যমে দেহস্থ তেজ এবং ব্রহ্মকে ব্রহ্মযোনি মিলন ঘটানোর পূর্ব্বে নারীর রজঃদর্শনকাল থেকে শুরু করে প্রসব করা কাল পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া গোপনীয় ক্রিয়া। তথাপি করম পরবে করমউতিগন অর্থাৎ করমব্রতীগণ কিশোর বয়সের ধান গাছকে অন্নভোজী সকল প্রাণীর উদর পুরনের প্রধান আহার্য্য দানা ধান দানা সৃষ্টি করার ক্রিয়া বিষক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিজেরা আচরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে আপনি আচরী ধর্ম্ম অপরে শিখায় প্রবাদ বাক্যটির বাস্তরিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। এতৎসূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় করম পরবে করমউতিগণ অর্থাৎ করমব্রতীগণ যে সকল নিয়ম-সংস্কার পালন করে থাকে সেগুলি নিজেদের জন্য পালন করে না। কিশোর বয়সের ধান চারা গাছকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে পালন করে। নিজেদের ব্যাপার তো গোপনীয় ব্যাপার। গোপনীয়ভাবে তারা তাদের কর্ম সম্পাদন করে থাকে। কৃষক কুড়মি জাতির করম পরব পালন করার মূল উদ্দেশ্য কিশোর বিয়সের ধান চারা গাছকে তার সময়বয়সী বিবাহিতা অথচ মাতৃত্বলাভ না করা মানবীকন্যা মাতৃত্বলাভ করার পথ নিজেরা আচরণ করে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

করম পরবে করম পূজার শেষ মুহূর্তে করমব্রতীগণ করম ডালকে রাজা অর্থাৎ স্বামী জ্ঞানে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে এবং প্রার্থনা করে "আপন করম, ভাইএক ধরম।" মানবীর স্বামী বৃক্ষ হতে পারে না। করমব্রতী তো বিবাহিতা। উদ্ভিদের স্বামী পঞ্চভূত করম পরবের মাধ্যমে কিশোর বয়সের ধান গাছ অবহিত হলো স্বামী লাভ ব্যতীরেকে মাতৃত্বলাভ করা যায় না। অতএব এক্ষেত্রেও করমব্রতীগণ নিজেদের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রার্থনা করে না। ধান গাছের পক্ষ অবলম্বন করে তার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রার্থনা তার স্বামী অর্থাৎ রাজা করম ডালের নিকট করে।

আপন মানে নিজের। করম মানে দেহস্থিত তেজ এবং ব্রহ্মকে মহাযোনিতে মিলন কৃষককের পরিবারের ছেলেপুলে। কৃষক মানবীস্ত্রীকে রমন করে ছেলেপুলে সৃষ্টি করে। অতএব কৃষকের সৃষ্ট কৃষকের পরিবারে সকল পোষ্য ধান দানার ভাতৃসম। ধরম শব্দটির 'ধ' অক্ষরটি ধর শব্দের প্রতীক অক্ষর। যার অর্থ তেজ এবং ব্রহ্মকে ধরে রাখা। জীব দেহে তেজ এবং ব্রহ্মকে ধরে রাখা মানে জীবন্ত থাকা মানে বেঁচে থাকা। জীব দেহে তেজ এবং ব্রহ্মকে ধরে রাখার উপায় সুসম খাদ্য গ্রহণ করা। মানব সমাজের উদর পুরনের প্রধান আহার্য্য কৃষকের উৎপাদিত ধান শস্য দানা। এতৎ সূত্রে করমব্রতীগণ ধান গাছের পক্ষ অবলম্বন করে অর্থাৎ ধান গাছের হয়ে তার স্বামী করম ডালের নিকট প্রার্থনা করে " হে করম রাজা তোমার দেহস্থিত তেজ এবং ব্রহ্মকে আমার দেহস্থিত তেজ এবং ব্রহ্মের সাথে মিলন ঘটিয়ে ধান শস্যদানা সৃষ্টি করে আমার ভাতৃসম কৃষকের পরিবারের পোষ্য সকলকে জীবন ধারনে সক্ষম হোক। উল্লিখিত ঘটনা প্রবাহর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় কিশোর বয়সের ধান গাছকে ধান শস্য দানা ফলানোর সমস্ত প্রক্রিয়া করমব্রতীগণের মাধ্যমে জ্ঞান দান করার উদ্দেশ্যে কৃষক কুড়মি জাতি করম পালন করে থাকে।

'ক' কার 'র' কার এবং 'ম' কার বর্ণ ত্রয়ের সমন্বয়ে গঠিত করম শব্দটি ভাষা আধারে শাব্দিক অর্থ প্রকাশের কারণে গঠিত শব্দ নয়। তন্ত্র ধর্মের ক্রিয়াতে ব্যবহার্য প্রতীক বর্ণে তন্ত্র ধর্মের ক্রিয়া প্রকাশের শব্দ।

৮।। জিতিআ পরব—

তন্ত্র ধর্মের ক্রিয়া সাধন পথে, করম পরবের মাধ্যমে ধান গাছকে শস্য দানা উৎপাদন করার জ্ঞানে জানবার করা হলো। কিন্তু উৎপাদিত শস্য দানা যদি পরিপুষ্ট দানা বিশিষ্ট না হয় অথবা পরিপক্কতা লাভের পূর্বে কিম্বা পরে ঝরে-পড়ে মাঠে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে "হেল পুতে আটকুঁড়া" অর্থাৎ পেয়েও না পাওয়ার দুঃখ ভোগ। সেই ভাবনাতে উৎপাদিত শস্য দানা যেন পরিপুষ্ট দানা বিশিষ্ট হয় এবং পরিপূর্ণ পক্কতা লাভ করে, ঝরে পড়ে নষ্ট না হয় অর্থাৎ সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে ধান সিসে সংযুক্ত থাকে সেই সব নিয়ম, নীতি, পদ্ধতি মাতৃত্ব লাভ করা শ্রেণীর মহিলাগণ ভাদ্র মাসের চাঁদের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে জিউ-তিআ অর্থাৎ জিতিআ পরবে নিজেরা আচরণ করে ধান গাছকে শিক্ষিত করে তোলার ভাবনা থেকে জিতিআ পরবের সৃষ্টি। তাই কৃষক কুড়মি জাতি যুগ পরম্পরা করম পরবের পরের কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে প্রতি বছর জিতিআ পরব মাধ্যমে শস্য অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্যদেবের পূজা করে।

করম পরবের মাধ্যমে কিশোর বয়সের (পহনা উমইরেক) ধান গাছকে ধান শষ্যদানা অর্থাৎ ধান ফসল ফলানোর পদ্ধতিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ফলে ধান গাছ যথাসময়ে শিস ভরতি ধানের ফল ফুটিয়ে তোলে। ফল ভরতি শিসে ধানের মাঠ পরিপূর্ন পরিদর্শন করে কৃষি স্রষ্টা কৃষিজীবি কৃষক কুড়মি জাতির মন প্রান আনন্দে নেচে উঠেছিল। পাশাপাশি অপরদিকে একটা আশঙ্কার ঘনঘোর অন্ধকার মেঘ মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, এই

কারনে যে যদি শিসে ধরা ধান ফল চাল পূর্ন না হয় তাহলে এই আনন্দের স্থায়ীত্ব কোথায়? ধান ফলের জীবন হলো পরিপূর্ণ চাল (ধান ফরকর জিউ হেহেইক ভরপুর চাউর দানা)। চালবিহীন ধান ফলকে দানা বলা হয় না। সেটাকে আগড়ি অথবা খেঁখরি বলা হয়। যা কৃষকের কোনো উপকারে আসে না বরং খামারে আবর্জনা বৃদ্ধি করে। তাই খামারকে পরিস্কার রাখার জন্য সেগুলোকে খামার থেকে দূরে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে আগুনে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়। অপরদিকে ধান ফলের ভিতরে থাকা চাল কেবল কৃষকের কেন সমস্ত মানব জাতির উদর পূরনের প্রধান আহার্য বস্তু। মানবেতর প্রনীকুলেরও লোভনীয় খাদ্যবস্তু। তাই কৃষিজীবি কুড়মি জাতি কৃষিকর্মের মাধ্যমে চাল পূর্ন ধান দানা ধান গাছ থেকে কামনা করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কৃষিকর্ম করে। উক্ত কামনা পূরনের কামনাতে তারা প্রতিবৎসর করম পরবের পরের কৃষ্ণপক্ষীয় চাঁদের অষ্টমী তিথিতে (এঁধরিআ আটদিনিআ চাঁদে) জিউতিআ জিতিআ পুজা বা পরব পালন করে।

তনতঁত অর্থাৎ তন্ত্র সাধনার পথে বহু পরীক্ষা নিরিক্ষাতে তারা উপলব্ধি করেছিল ধান ফলের জীবন চাল। ধান ফলে চালের সঞ্চার ঘটাতে জিউতিআ জিতিআ পরব পালন করা শুরু করে। জিতিআ পরব পালন করা একমাত্র উদ্দেশ্য ধান গাছের শিসে ধরা ধান প্রতিটি ধান ফলে যেন তার জীবন চালের সৃষ্টি হয়।

তন্ত্র সাধনার মাধ্যমেই কৃষক কুড়মি জাতি উপলব্ধি করেছিল কেবলমাত্র মাতৃত্বলাভ করা মহিলাগণ দ্বারা ধান গাছে ফল ধরা প্রতিটি ফলে তার জীবন চাল সৃষ্টি করা বিষয়ক শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব। কারন তাঁরা জানেন কোন কোন আচার আচরন পালনের মাধ্যমে গর্ভাশিয়ে ভ্রুনের সৃষ্টি হয় এবং সেই ভ্রুন কিভাবে মানব শিশুতে পরিনত হয় এবং যথাসময়ে প্রসবের মাধ্যমে কোলে শিশু প্রাপ্তি ঘটে। উক্ত কারনে কেবলমাত্র মাতৃত্ব লাভ করা মহিলাগনই জিতিআ পুজা করার অধিকারী।

প্রকৃত পূজক কৃষিজীবি কুড়মি জাতি জিতিআ পূজাতে প্রধানত আঁক বা ইক্ষুর সহযোগী বন আাদা, বন কেঁউতাঁ, বট গাছের ডাল ইত্যাদির পূজা করে থাকে। আঁখ বা ইক্ষু, বন আদা, বন কেঁউআঁ এগুলো সবকটা লতা জাতীয় এককে প্রকার শাখা প্রশাখা বিহীন গাছ। যেগুলির আগাগোড়া সমস্ত কান্ড মিষ্ট রসে ভরপুর থাকে। ইক্ষুর রস থেকে কুড়মি জাতি গুড় এবং চিনি উৎপাদন করে। আঁখ, বন আদা, বন কেঁউআঁকে পূজ্য ঠাকুর জ্ঞানে পূজা করার প্রধান কারন আঁখ যেভাবে গোটা কান্ড জুড়ে ভরপুর রসে পরিপূর্ন থাকে সেইভাবে আমার কৃষিকর্মে উৎপাদিত দান গাছের শিসে ধরা ধান ফলও যেন তার জীবন পরিপূর্ন চালে পূর্ন থাকে।

৯। দেসৈঁই—

অশ্বিন মাসের চাঁদের শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমী তিথি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধান গাছের

গর্ভাশয়ে ধানের শিস গর্ভস্থ হয় অর্থাৎ ধান গাছ গর্ভধারন করে। কুড়মালি সংস্কৃতির শরীরী সংস্কৃতিতে গর্ভাধারিনীকে পিত্রালয়ের চব্যচুষ্যলেহ্যপেয় খাদ্যের লালসা মিটিয়ে প্রসবকালে পিত্রালয়ের খাদ্যের প্রতি পিছুটান অর্থাৎ লালসাজনিত মনের দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বিঘ্নে প্রসব করার মনোবল বাড়ানো এবং গর্ভস্থ শিশুকে আগামী দিন মামার প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলার ভাবনা থেকে গর্ভধারিনীর গর্ভের নবম মাসে সধউড়ি খাউআউঅন অর্থাৎ সাধভক্ষণ করানোর প্রথা প্রচলিত আছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে সধউড়ি খাওয়াতে আজিমা এবং দুধুমা সম্পর্কিয়া মহিলাগণ যান। এর অর্ন্তনিহিত কারণ তাঁরা গর্ভধারিনীকে প্রসব করার কৌশল এবং নিয়মবলি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কৃষক কুড়মি জাতি শরীরী সংস্কৃতির উক্ত নিয়ম এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতির দেঁসেই পরব অনুষ্ঠানে গর্ভধারিনী ধান গাছকেও নির্বিঘ্নে ধান শিস প্রসব করার পথ প্রশস্ত বা সুগম করার বিশ্বাসে দেঁসেই পরবে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের চাঁদের শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে ক্ষেত জাগানো অনুষ্ঠানে মাধ্যমে সধউড়ি খাউআউঅন অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১০।। জিরহুল—

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিনে কৃষক কুড়মি জাতি জিরহুল উৎসব পালন করে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় সকল ধান সিস ধান গাছের গর্ভ থেকে নির্বিঘ্নে প্রসূত হয়ে থাকে। মাঠ ভরা ধান শিস কৃষক কুড়মি জাতির অন্তরে অবস্যই আনন্দের সঞ্চার ঘটিয়েছিল কিন্তু সাথে সাথে ধানের পরিপক্ব শস্য দানা ঝাড়াই করার উপযুক্ত স্থান নিরূপনের ভাবনায় ভাবিত করেছিল। কারণ বর্ত্তমান কালের ন্যায় সেই সময়ে উৎপাদিত শস্য দানা ঝাড়াই করার জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষিত স্থান স্থায়ীভাবে নিরূপিত ছিল না। সেই ভাবনাতে ভাবিত হয়ে কৃষক কুড়মি জাতি উক্ত স্থান নিরূপন করা এবং উপযুক্তভাবে তৈরী করা কাজের সূচনা করার জন্য জ্যোতিষ গণনাতে প্রাজ্ঞ কুড়মি জাতি জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিনটি শুভ এবং প্রশস্ত দিন জানতে পেরেছিল। তাই যুগ পরম্পরা কুড়মি জাতি আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিনে খামার তৈরী করা কাজের সূচনা করে থাকে এবং তৎনিমিত্তে উৎসব পালন করে।

১১।। বঁদনা অথবা সেঁহরেই পরব—

কার্ত্তিক মাসের প্রথম অমাবস্যা তিথিতে কৃষক কুড়মি জাতি বঁদনা অথবা সেঁহরেই পরব পালন করে। এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর ধান গাছে ধানের শস্যদানা পেকে যায়। আবার কয়েকটি শ্রেণীর ধান গাছে শস্যদানা পাকার মত অবস্থাতে থাকে। এক কথায় বলা যেতে পারে ধানের ফসল ফলানোতে কোনও শঙ্কা বা বাধা বিঘ্ন থাকে না। এই অবস্থাতে যে গবাদি পশুর কঠোর পরিশ্রমে কুড়মি জাতি ধানের ফসল ফলানোতে সক্ষম হয়েছিল বঁদনা পরবের প্রথম পর্যায়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতিস্বরূপ তেল দেওয়া এবং ঘাউআ নিয়ম পালনের মাধ্যমে সেই গবাদি পশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য যথাযত সেবা-শুশ্রূষা করার নিয়ম-নীতি

পালন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কুড়মি জাতি কৃষি কর্মে সহায়ক গবাদি পশু যাঁর অশেষ শুভাশীর্ব্বাদে পেয়েছিল সেই বুড়হাবাবাকে বাঁদনা পরবে (গঠরইআ) গরইআ নেঁউতা এবং গরইআ পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে গরইআ ঠাকুরের শুভাশিষ পাওয়ার কামনাতে কুড়মি এবং গবাদি পশুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ধানের ফসল ফলানোতে সাফল্য লাভের আনন্দে মেতে ওঠে। অপর দিকে উক্ত দিবসেই অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের প্রথম অমাবস্যা দিনে কুড়মির জীবন জীবিকা নির্বাহের অধিষ্ঠাতা দেবতা বুড়হাবাবা বিচার সভা বসাতে কুড়মি ঘরে আসবেন। অতএব জাঁকজমক সহকারে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁর রুচিসম্মত আহার্য্যাদির মাধ্যমে আপ্যায়ন করা কুড়মির ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য। তাই এই দিনটি কুড়মি জাতি গঠ + রইআ গরইআ নেউতা দিন রূপে পালন করে। যেহেতু বিচারসভা বসাতে বুড়হাবাবার আগমন। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে কিসের বিচার? কোন বিচার? কার বিচার? উত্তর অত্যন্ত সরল। কুড়মির বুড়হাবাবা যষ্ঠী দ্বারা ভূমি কর্ষণ করে উৎপাদিত শস্য দানা দিয়ে কুড়মির খাদ্যাভাব মেটানো অসম্ভব। তাই তারা খাদ্যাভাবে জর্জরিত। কুড়মির উক্ত দুর্দশা গোচরীভূত হয়ে তাঁর বাহন বাসুআ বলদকে কুড়মির বসতভুমিতে পাঠিয়ে বাসুআ মারফত কুড়মিকে বার্ত্তা পাঠালেন যেন কুড়মি তিনবার স্নান করে এবং মাত্র একবার অন্ন গ্রহন করে। বাসুআ কিন্তু বিপরীত বার্ত্তা 'যেমন দিনে একবার স্নান করে এবং তিনবার অন্নগ্রহন করা' পরিবেশন করে বুড়হাবাবা সমীপে হাজির হয়। বাসুআ দ্বারা পরিবেশিত বার্ত্তাতে বুড়হাবাবা চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যেন যষ্ঠীর পরিবর্ত্তে যদি বাসুআ লাঙ্গল টেনে অধিক পরিমাপের জমি কর্ষণ করাতে কুড়মিকে সহায়তা করে তাহলে অধিক পরিমানের শস্য দানা উৎপাদিত হবে এবং কুড়মির খাদ্যাভাব মেটানো সম্ভব হবে। তাই তিনি বাসুআকে পুনরায় কুড়মির বসতভুমিতে পাঠালেন এবং অধিক জমি কর্ষনে লাঙ্গল টেনে কুড়মিকে কৃষিকর্মে সহায়তা করার নির্দেশ জারি করলেন। বাসুআর প্রতি এই নির্দেশ জারি হওয়ার বার্ত্তা বাসুআর মাতা কপিলা গাইয়ের কর্ণ গোচর হয়। তখন মাতৃস্নেহে ভরা কপিলার অন্তরে করুণার উদ্রেক হয় এবং বাসুআকে লাঙ্গল টানার মতো কঠিন পরিশ্রমে কাজে পাঠাতে কুন্টাবোধ করে এবং বাসুআর সাথে সে নিজেও লাঙ্গল টানার কাজ করতে সম্মত হয়। বাসুআ এবং কপিলার পরিকল্পিত বাসনাতে বাসুআর অপর দুই ভ্রাতা বাসুআ এবং কপিলার সাথে গিয়ে লাঙ্গল টানার কাজে সহায়তা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতএব চার মা ছেলে কুড়মির বসতভূমিতে আগমন করে এবং লাঙ্গল টানা কাজে কুড়মিকে সহায়তা করে। লাঙ্গল টানার সময় বাসুআরা ভুল চালে চলার জন্য কুড়মি পইনা দিয়ে বাসুআদের গায়ে যত্রতত্র আঘাত করে। ফলে বাসুআদের গায়ে যত্রতত্র ক্ষতের ঘা দেখা দেয়। ঘায়ের জ্বালা যন্ত্রণাতে বাসুআদের মুমুর্যু অবস্থা অথচ বাসুআদের সেবা -শুশ্রূযাতে কুড়মি ভ্রুক্ষেপ করেনি। এমতাবস্থাতে বাসুআরা পরিকল্পনা করে বুড়হাবাবার নির্দেশানুযায়ী তাদের কুড়মিদের লাঙ্গল টানা কাজে এসে তাদের এই দুর্দশা তাই তাঁকে নালিশ জানানো প্রয়োজন। নালিশ জানানো প্রয়োজন বোধে তারা বুড়হাবাবার নিকট আসার পরিকল্পনা করে এবং যাত্রা শুরু করে। পথে অনেক

বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে তারা বুড়হাবাবা সমীপে হাজির হয় সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলে। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বুড়হাবাবা বাদী ফরিয়াদীর উপস্থিতিতে বিচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং উক্ত বিচারে যেন কুড়মি অবশ্যই উপস্থিত থাকে এই নির্দেশ দিয়ে বাসুআদেরকে পুনঃরায় কুড়মি বসতভূমিতে পাঠালেন। বাসুআদের মারফত কুড়মি সমস্ত ব্যাপার অবগত হয় এবং নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার জন্য বাসুআদের সেবা শুশ্রুষাতে মনোনিবেশ করে এবং বাসুআদেরকে সুস্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যবান করে তোলে। অতএব বাসুআরা কুড়মিকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো কোনো প্রমান দর্শাতে সক্ষম হবে না। উপরন্তু উক্ত রাত্রিতে জাহলি বুলার মাধ্যমে কুড়মি গিত বাজনা নাচ সহকারে বুড়হাবাবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই। জাহরি শব্দ থেকে জাহলি শব্দটির সৃষ্টি। জাহির শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ প্রচার। জাহরি শব্দটির অর্থ প্রচার। যে নিজের সুনাম বা খ্যাতি নিজে প্রচার করে বেড়ায় তাকে জাহরি বলা হয়। এক্ষেত্রে কুড়মি নিজেকে নির্দোষ প্রমানের খ্যাতি জাহির করে বেড়ানোকে জাহলি বুলা বলা হয়েছে। গঠ পুজাতে যে মালিকের গবাদি পশু সিরঅ নির্বাচিত হয় সেই মালিকের অঙ্গন থেকে জাহলি বুলা শুরু করার প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। গরইআ নেউতা রাতে সমস্ত কুড়মি গ্রাম জাহলি বুলা গিত বাজনা নাচে উত্তাল হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে নেউতা শব্দে নিমন্ত্রণ করা অর্থ প্রকাশ করে না। নেউতা শব্দটি খাওয়া ধওয়ানো অর্থ প্রকাশ করে। বুড়হাবাবা নিজে আসার আগমন বার্ত্ত পাঠিয়েছেন অতএব তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে অসার প্রশ্নই উঠে না। উদাহরণের মাধ্যমে নেউতা শব্দে খাওয়ানো ধওয়ানো অর্থ প্রকাশের উদাহরণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। যেমন কি রে শ্বশুর বাড়ীতে কেমন নেউতিলঅ। চাবন চাটন চুহন পিঅন সবরকম নেউতনি পালে ইত্যাদি। তাই তো কুড়মি জাতি তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহের অধিষ্ঠাতা দেবতা বুড়হাবাবাকে দুধে গুড়ে দ্রবীভূত করে ঘিয়ে ছাঁকা পিঠা দিয়ে অপ্যায়ন করে অর্থাৎ ঘিয়ের পিঠা ভোগ অর্পণ করে। এইভাবে গরইআ নেউতা পরব সমাপন করে। গোয়াল ঘরে ঘিয়ের জাগর বাতি জ্বালিয়ে সারারাত আলোকিত করে। গোয়াল ঘরে গরু ঢোকার পূর্ব মূহুর্তে গবাদি পশুকে কাঁচি দিয়ে দেখানো হয়। পশু খাদ্য ঘাসের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এইভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমানের নানবিধ কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং জাহলি বুলে অমাবস্যা রাত্রি অতিবাহিত করা হয়। পরদিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের ইজতিআ ১লা চাঁদে গরইআ পূজা পালন করা হয়। গঠ রইআ পুজা- এই দিনে কৃষিজীবি কুড়মি জাতি তাদের জীবিকা নির্বাহের অধিষঠাতা দেবতা বুড়হাবাবার আড়াধনা উপাসনা আরদাস করে থাকে। বুভুক্ষু কুড়মির খাদ্যাভাব লক্ষ্য করে করুনা ভরা বুড়হাবাবার অন্তর কেঁদে উঠেছিল এবং দয়াপরবশ তিনি কুড়মিকে কৃষি সহায়ক পশু গো মহিষাদি আর্শীবাদ স্বরূপ প্রদান করেন। তৎসূত্রে বুড়হাবাবা কর্মানুসারে প্রাপ্ত নাম গঠরইআ গরইআ ঠাকুররূপে গো মহিষাদির অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে পুজিত হয়ে থাকেন। গো মহিষাদি পশু এবং মানুষ বুনো অবস্থাতে থাকাকালে পরপর পরস্পরের শত্রু মনোভাব পোষন করতো। প্রয়োজন এবং সুযোগে পরস্পর পরস্পরের প্রনহানি করতো। উভয়ের সম্পর্ক ছিল মারক এবং মারইআ। মারক এবং মারইআ সম্পর্ক ছিন্ন করে বুড়হাবাবা 'হ' শব্দে গোমহিষাদি পশুকে শান্ত করে

এবং 'র' শব্দে মানুষকে শান্ত করেন এবং উভয়ের মিলন ঘটান। তৎসূত্রে কুড়মি জাতি কুড়মালি ভাষা বিচারে বুড়হাবাবার কর্মানুসারে বুড়হাবাবাকে হর নামে নামকরণ করে।

গরইআ পুজার নেগচার অর্থাৎ নিয়ম সংস্কারঃ- এই দিন গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী উপবাস পালন করে এবং উপবাত থাকা অবস্থাতে গৃহকর্তা গোমহিযাদি পশুর মাথায় মুকুট অর্থাৎ মেড়িয়র গাঁথার জন্য মাঠ থেকে পাকা ধান গাছ কেটে আনেন। কেটে আনা ধান গাছের মধ্য থেকে শীর্যে যোলটা রই অর্থাৎ প্রশাখা থাকে সেই সোরঅ রই বিশিষ্ট শীযের ধান গৃহকর্ত্রী সংগ্রহ করে এবংসোরঅ রই বিশিষ্ট ধানে গরইআ পুজা সমাপন করার পর বাড়ীর সমস্ত পতউহু অর্থাৎ বৌমা সম্পর্কীয়া মহিলাগণ গো মহিযাদি পশুকে চুমায়। সরঅ রই থাকা ধানে চুমানোর সূত্রে পরবটাট নাম সঁহরই/সেঁহরেই নামে নামকরণ করার যৌক্তিকতা অনুসন্ধান করা যায়। এতৎসূত্রে কুড়মি পরিবারে ধিআ অর্থাৎ মেয়ে এবং পতউহু অর্থাৎ বৌমাদেরকে পিত্রালয়ে অথবা শ্বশুরালয়ে থাকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করার বিধান নির্দ্ধারিন করা আছে। গৃহকর্তা মেড়িঅর গাঁথার পর গৃহকর্ত্রীর সহযোগীতাতে গো মহিষাদি পশুকে সাজানোর পর গৃহকর্ত্রীর সহযোগীতাতে গৃহকর্তা গরইআ পুজা সমাপন করেন। তারপর গৃহকর্ত্রী সকল বৌমাদেরকে নববস্ত্রে সজ্জিত করে গো মহিযাদি সকল পশুকে সরঅ রই ধানে এবং দুর্ব্বাঘাসে চুমান। চুমান পর্ব পরসমাপ্তির পর খাওয়া ধওয়া সারার পর গৃহকর্ত্রী আঁচলে সরিষা ভেলুআ বঁগউরা নিয়ে ডান হাতে সরুআ অথবা নতুন খাপরাতে আগুন নিয়ে গোয়ালে প্রবেশ করেন এবং গো-মহিষাদি সকল পশুকে নিমছার মাধ্যমে বঁদেন। বঁদা শব্দের অর্থ অশুভ শক্তির হানিকারক শক্তিকে প্রতিরোধ করা। তৎসূত্রে বঁদার বানী হচ্ছে- রচইতে বাঝইতে কাজাপ কনঅ বদনেজরইআক মর চরাপিধননকে নেজরাউলে অকর আঁইখে সেইরষা ভেলুআ বঁগউরা— এই বানী উচ্চারনের সাথে গো-মহিষাদির আপাদমস্তক সেইরষা ভেলুআ বঁগরাকে মুষ্টিবদ্ধ মুঠাটা ঘুরান এবং ডান হাতের ধরে রাখা পাত্রের আগুনে নিক্ষেপ করেন। তারপর পাত্র গ্রাম শুরুর প্রন্তে অথবা গ্রাম সমাপ্তির প্রান্তে নিক্ষেপ করেন। বঁদা শব্দ থেকে পরবটির নাম বঁদনা পরব হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এমনকি অবাস্তব বা অযৌক্তিকও নয়। এইদিনে একাধারে গোমহিযাদি পশু সকলের সেবা শুশ্রুষা অপরদিকে কৃষি উপকরণ সমূহে নবীকরন করা হয়। উল্লিখিত নেগচার মাননের পালনের আরও কিছু টুকিটাকি নেগাচার যেমন গরইআ পুজার দিন গুসটিতে প্রচলিত থাকা কৌশলে অঙ্গন শুরু হওয়ার প্রান্ত সীমা থেকে শুরু করে গোয়াল ঘরের দোরগড়া পর্যন্ত চউক পুরা এবংগোমহিষাদি পশু চুমানোর আগে চলতি মরশুমে উৎপাদিত সরত রইআ শিসের ধানে কৃষি উপকরন সমূহকে চুমানো নেগচার মাননের মাধ্যমে গো-মহিযাদি পশুর সেবা শুশ্রুযা এবং গো মহিষাদি পশু অধিষঠাতা দেবতা গরইআ ঠাকুরের গরইআ নেউতা এবং গরইআ পুজা পরব সম্পন করার পর অর্থাৎ কার্তিকিআ চাঁদের ইজতিআ দুই দুনিআ চাঁদে বরদখুঁটা পরব পালন করা হয়।

বরদ খুঁটাঃ- এই দিন কুড়মি এবং গো-মহিযাদি পশু কৃষি কর্মে সাফল্য লাভের জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং কাড়া বরদ খেলানোতে মত্ত হয়ে উঠে।বরদ খুঁটা অনুষ্ঠানে গিত,

বাজনা, নাচের মাধ্যমে উভয়েই অপার আনন্দ উপভোগ করে। চতুর্থ পর্যায়ে বরদ খুঁটা পরবের পরদিন গুঁড়ি বাঁধনা অপভ্রংশে বুড়ি বাঁধনা পরব পালন করা হয়। এই পরবটির উৎপত্তি কিন্তু কৃষিকর্ম আধারিত ভাবনা থেকে নয়। গবাদি পশুর বংশবৃদ্ধির ধারা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ ঘটানো এবং অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত কারণে পালন করা হয়। কুড়মালি ভাষাতে গুঁড়ি শব্দে দুই শ্রেণীর গাভী অর্থ প্রকাশ করে। যথা ঃ- ১) বাঁঝি অর্থাৎ বন্ধ্যা ২) বেহলি অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতা থাকার বয়স থাকা স্বত্বেও প্রজননে অক্ষম। এই গুঁড়িকে বেঁধে নাচানো, খেলানোতে তার গর্ভাশয় পরিস্কার হয় এবং গরম হয়, গর্ভাধারন করার পথ পরিস্কার হয়। গুঁড়ি ও তো গরু তাই গবাদি পশুকে আনন্দ উপভোগ করানোর সাথে গুঁড়ির গুঁড়িত্ব দূরীকরণ করার কারণে গুঁড়ি বাঁধনা পরবটি বঁদনা পরবের সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

১২।। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ডিনিমাঁই (শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আনা, টুসু থাপনা—

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি সময়ের মধ্যে কৃষক কুড়মি জাতি শিসে ধান দানাযুক্ত ধানগাছ মাঠ থেকে কেটে খামারে এনে তোলার কাজ সম্পন্ন করে। তাই সেই দিনে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন কৃষক কুড়মি জাতি যথাযথ নিয়ম পালনের মাধ্যমে পরিবারের প্রধান অথবা অভিভাবক মাঠ থেকে ডিনিমাঁইকে ঘরে এনে তোলে।

অপরদিকে উক্ত দিবসে পরিবারের অবিবাহিতা কিশোরী কন্যাগণ এক মাস ব্যাপি টুসুকে ঘরে রেখে দৈনন্দিন যথাযথ সন্ধ্যা প্রদীপের আলোকে উদ্দীপ্ত করে এবং উপযুক্ত পুষ্পাদি অর্পন করে গিত, নাচের আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে নারীধর্ম পর্যবেক্ষন করার জন্য টুসু স্থাপন করে।

মাঠের ধান খামারে এনে তোলা হলো অতএব ডিনিমাঁইকে ও মাঠ থেকে এনে ঘরে তোলা হলো। যেহেতু ডিনি মাঁই, তাই তিনি ঘরে অবস্থান করে পুত্র বৎ কৃষক কুড়মি জাতিকে উদর পূরণের শস্য দানার যোগান দিয়ে মাতৃ ধর্ম পালন করে।

কিন্তু এই যে টুসু - এই টুসু কি বা কে এর সাথে কৃষির অথবা কৃষক কুড়মি জাতির সম্পর্কই বা কি? এই সব প্রশ্নের বিজ্ঞান সম্মত জবাব অনুসন্ধানের দিন এসেছে। কারণ টুসু পরব বর্ত্তমানে কৃষিস্রষ্টা কৃষক কুড়মি জাতির মধ্যে অথবা কুড়মালি সংস্কৃতি পালনকারী জনজাতি মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিখ-শিখর-নাগপুর-আধা আধি খড়গপুর অর্থাৎ বৃহৎ ঝাড়খন্ড এলাকা এমনকি তৎসংলগ্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী সমস্ত শ্রেণীর মানুষ জাতীয় উৎসব রূপে পালন করে। সার্ব্বজনীন এবং জাতীয় পরবের মর্যাদায় পালিত হওয়াটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয়। কিন্তু সার্বজনীন রূপ পাওয়াতে যদি তার মৌলিকতা হারিয়ে যায় তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখদায়ক হবে। কারণ কৃষিকর্মে জীবিকা নির্বাহ করা এবং তন্ত্র ধর্মে জীবনযাপন করা আধারে কুড়মালি ভাষাতে সৃষ্ট সর্ব প্রাচীন কুড়মালি সংস্কৃতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

কুড়মালি সংস্কৃতির বারো মাসে তের পরবের এ যাবৎ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ডিনিমাঁই আনা পর্যন্ত সবগুলি কৃষি কর্মের সাথে সংযুক্ত থাকা অথবা কৃষিকর্ম আধারে পালিত হওয়ার বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ পাওয়া গেছে। অতএব টুসুর পরিচয় ও কৃষিকর্মের ক্রিয়ার মধ্যে অনুসন্ধান করাটা বিজ্ঞান সম্মত হবে।

কুড়মালি ভাষার 'টু' এবং 'সু' শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে টুসু শব্দটি গঠিত। কুড়মালি ভাষাতে টু শব্দের অর্থ হৃষ্ট-পুষ্ট এবং সু শব্দের অর্থ স্বামী। টুসু শব্দের অর্থ হৃষ্টপুষ্ট ধানদানার স্বামী মিলন। অর্থটির বিজ্ঞান সম্মত সত্যতা এবং নামের সার্থকতা প্রমাণের পথ টুসু স্থাপন করার উপকরণ এবং অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত ত্রিশ দিন পরিচর্যার মাদ্যমে পর্যবেক্ষণে রাখার তাৎপর্য অনুসন্ধান করা। টুসু স্থাপন করার উপকরণ ঃ- ১) মাঠ থেকে কুড়িয়ে সংগ্রহ করা ধান শিসের ধান দানা, হৃষ্টপুষ্ট ধানদানার প্রতীক ২) বকনা বাছুরের গোবর, অত্যধিক উর্ব্বরতার প্রতীক ৩) লগ্নবাঁধা চালের গুড়ি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রতীক। ৪) শাল গাছের বাঁদার (গম্থি) ফুল, দীর্ঘদিন অম্লান থাকার প্রতীক ৫) পেথিআ অর্থাৎ বাঁশ নির্ম্মিত ছোট আকারের ঝুড়ি স্থাপন করার পাত্র। ৬) সারুআ অর্থাৎ মাটি নির্ম্মিত ঢাকনা ৭) দর্বা ঘাস, সবুজের প্রতীক। ত্রিশ দিন পর্যবেক্ষনে রাখার তাৎপর্য টু অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট ধান ধানার রজোদর্শন পর্যবেক্ষণ করা। প্রতি সাতাশ দিন অন্তর যৌবনবতী নারীর রজঃস্বলা হয় এবং রজঃস্বলা কাল তিন দিন। সর্বমোট ত্রিশ দিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া যায় টু অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট ধানদানা রজঃস্বলা হয়েছে। অতএব সে স্বামী সহবাসযোগ্যা। তাই টুকে তার সু অর্থাৎ স্বামী সহবাসে পাঠিয়ে যুগলমিলন মিলানোকে টুসু বলা হয়েছে। উদ্ভিদের স্বামী পঞ্চভূতের সমাহার স্রোতস্বিনী। তাই টুসুকে তার সু স্রোতস্বিনীর সাথে রতিক্রিয়াতে মিলন উদ্দেশ্যে পাঠানো ক্রিয়া শুরু করা অথবা পরিবেশ তৈরী করাকে টুসু স্থাপন করা বলে।

১৩।। মকর সংক্রান্তি অথবা পৌষ সংক্রান্তি—

পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূর্বের তিন দিন থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সর্বমোট চার দিন ব্যাপী কৃষি স্রষ্টা কৃষিজীবি কুড়মি জাতি সূর্য্যদেবের অয়ন পরিবর্ত্তন আধারে তাদের আদরের টু অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট পুরষ্ট ধান শস্য দানাকে তার সু অর্থাৎ স্বামী স্রোতস্বিনীর সাথে রতিক্রিয়াতে মিলন উদ্দেশ্যে শশুরালয়ে পাঠানোর বিদায় দেওয়াকে কেন্দ্র করে মকর পরব বা টুসু পরব পালন করে। এই পরব পালন করার বিজ্ঞান সম্মত উদ্দেশ্য যুগ পরম্পরা আগত বৎসরে ও কৃষি কর্মের দ্বারা মনুষ্য জাতির উদর পূরণের প্রধান আহার্য্য শস্য দানা কৃষিজ ধান দানার উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখা। প্রাকৃতিক পরিবেশ আধারে উদ্ভিদ জগতের তৃণলতা, গুল্মের জন্ম, ফুল, প্রস্ফুটিত হওয়া, ফল ধরা এবং মৃত্যু হয়ে থাকে। সূর্য্যদেবের অবস্থান আধারে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্ত্তন হয়। জ্যোতিষ বিচারের দ্বারা কুড়মিজাতি প্রমাণ পেয়েছিল সূর্য্যদেবের দক্ষিণায়নে অবস্থান পৌষ সংক্রান্তিতে সমাপ্ত হয় এবং উত্তরায়নে সরা বা নড়া শুরু হয়। অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিটি সূর্য্যদেবের দক্ষিণায়নের এবং উত্তরায়নের সন্ধি সংক্রান্তি।

সন্ধিক্ষণে পৌঁছানোর পদ্ধতিটিকে কৃষক কুড়মি জাতি তার মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষাতে আঁউড়ি চাঁউড়ি, বাউড়ি এবং মকর নামে নাম করন করেছে।

আঁউড়ি ঃ- মূল শব্দ আউড়াউঅন যার বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ শুরু করা। আউড়াউঅ শব্দের প্রথম পুরুষ, একবচন, স্ত্রী লিঙ্গে আউড়াউলি শব্দ থেকে আঁউড়ি শব্দের উৎপত্তি সূর্য্যকে কুড়মালি ভাষাতে বেরা বলা হয় এবং লিঙ্গ নিরূপণে বেরা স্ত্রী লিঙ্গ তাই আঁউড়ি বলা হয়েছে।

চাঁউড়ি ঃ- মূল শব্দ চঁউরন যার বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ সরা অথবা নড়া। চঁ উরন শব্দে ক্রিয়ার বিশেষণে চঁউরে শব্দ থেকে চাঁউড়ি শব্দের উৎপত্তি।

বাঁউড়ি ঃ- মূল শব্দ বাঁউআঁমুহড়ি যার বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ বামমুখে। মকর ঃ- 'ম'কার 'ক' কার এবং 'র' কার বর্ণত্রয়ের সংযুক্তিতে মকর শব্দটি গঠিত। যেহেতু কৃষিজীবি কুড়মি জাতি জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পেশা কৃষিকর্ম এবং জীবনধারণের একমাত্র ধর্ম তন্ত্রধর্ম। তাই তন্ত্রধর্মালম্বী কৃষক কড়মি জাতির মাতৃ ভাষা কুড়মালি ভাষাতে সৃষ্ট কুড়মালি সংস্কৃতির শরীরি আনুষ্ঠানিক এবং আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সবগুলিতে তন্ত্র ধর্মের আবশ্যকীয় ক্রিয়া এবং ক্রিয়া প্রকাশের প্রতীক বর্ণ ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। যেমন ঃ- মকর, করম, জনম, মরন, গরাম ইত্যাদি শব্দের ব্যবহৃত বর্ণগুলি তন্ত্র ধর্মে তনস্থিত তেজ, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মযোনি অর্থ প্রকাশের প্রতীক বর্ণরূপে ব্যবহার হওয়ার বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ ঃ- মকর শব্দে ব্যবহৃত 'ম' কার মানে ব্রহ্ম, 'ক' কার মানে ব্রহ্মযোনি এবং 'র' কার মানে তেজ। জীব দেহস্থিত ম অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং র অর্থাৎ তেজ যথোপযুক্ত মাত্রামাফিক পরিমানে সক্রিয় অবস্থাতে ব্রহ্মযোনিতে সংমিশ্রণ ঘটা ব্যতীরেকে জীব সৃষ্টির সৃজন হয় না। কিন্তু মকর শব্দে জীব সৃষ্টির উৎস ম এবং র অর্থাৎ ব্রহ্মের এবং তেজের সংমিশ্রণ ঘটা অসম্ভব। কারণ ম এবং র এর মাঝখানে ক অর্থাৎ ব্রহ্মযোনি অবস্থান করছে।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা কৃষিস্রষ্টা কৃষিজীবি কুড়মি জাতি বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ পেয়েছিল সূর্য্যদেবের দক্ষিণায়নে অবস্থানকালে ধান শস্য দানার প্রকৃতভাবে অঙ্কুর উদ্গত হয় না। মকর সংক্রান্তিতে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়নে অবস্থান সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ ধান শস্য দানার প্রাকৃতভাবে অঙ্কুর উদ্গগত না হওয়ার মেয়াদের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতএব মকর শব্দের অর্থ ধান শস্যদানার অঙ্কুর উদ্গত না হওয়ার মেয়াদ শেষ হওয়া কুড়মালি সংস্কৃতির মকর পরবের টুসু গিতে উক্ত অর্থের বিজ্ঞান সম্মত সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক এবং সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায় উদাহরণ ঃ- তিরিসদিন রাখলি টুসু। তিরিস সঁইনঝা দেইএগঅ। আর নি রাখইএ পারি মকর হেলা বাদি গআ গীতটির বাংলা ভাষাতে তরজমা হচ্ছে ঃ- ত্রিশ দিন রাখলাম টুসু। ত্রিশ সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ো আর রাখতে পারছি না। মকর শত্রু হলো। গীতটির ভাবার্থ শস্য ধানের হৃষ্টপুষ্ট দানা অর্থাৎ টু এর অঙ্কুর অদ্গতা হওয়ার মেয়াদ শেষ মানে মকর আসা। মকরের আগমন টু এর শত্রু এই কারণে কৃষিজীবি কুড়মি জাতি কৃষি কর্মের দ্বারা আগামী বৎসরও টু এর অঙ্কুর উদগত হওয়া আধারে ধান শস্য দানা উৎপাদনে সক্ষম হবে।

উল্লেখ করা হয়েছে মকর সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তি সূর্য্যদেবের দক্ষিনায়ণের এবং উত্তরায়ণের সন্ধি সংক্রান্তি। এতএব উক্ত সংক্রান্তিতে টু এর অঙ্কুর উদ্‌গত না হওয়ার পরিসমাপ্তি এবং অঙ্কুর উদ্‌গত হওয়ার শুরু কিন্তু টুকে তার সু অর্থাৎ স্বামীর সাথে রতিক্রিয়াতে মিলানো ব্যতীরেকে অঙ্কুর উদগত হওয়া অসম্ভব। টু এবং সু এর যুগল মিলনকে টুসু বলা হয়েছে। সূর্য্যদেবের অয়ন পরিবর্ত্তনের পদ্ধতিকে বলা হয়েছে আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর। সামগ্রীকভাবে ভাবার্থ উচরাউলি চঁউরে বাঁউআঁমুহড়ি নিআঁকরান সিরাউএ আর আঁকরান উচরাউএ। বাংলা ভাষাতে এর তরজমা শুরু করলো সরতে বামমুখে অঙ্কুর উদগত না হওয়া শেষ করে অঙ্কুর উদগত হওয়া শুরু করতে।

কৃষিস্রষ্টা কৃষিজীবি কৃষক কুড়মি জাতি মনুষ্য সমাজের উদর পুরনের প্রধান আহার্য শস্যদানা হৃষ্টপুষ্ট ধানদানা অর্থাৎ আদরের টুকে তার স্বামী অর্থাৎ সু সহমিলন হেতু শশুরালয়ে পাঠাবে। অতএব যানটিও যোগ্য যান হওয়া উচিত। যোগ্যতা বিচার করতে গিয়ে কুড়মি জাতি চিন্তা করেছিল চউড়ল হবে যোগ্য যান। চউড়ল টুসু নয়, টু এর সু সহমিলন হেতু শশুরালয়ে যাওয়ার যান মাত্র। কুড়মালি ভাষার চউ এবং উড়ল শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে চউড়ল শব্দটির উৎপত্তি। চউ শব্দটির অর্থ চাইরঅবাটে এং উড়ল শব্দটির অর্থ উড়নে বলিয়ান। বাংলা ভাষাতে অর্থ চারদিকে উড়তে বলবান। চারিদিকে উড্ডয়নে বলবান একমাত্র সূর্য্যকিরণ তাই টু সূর্য্যকিরণ অর্থাৎ চউড়লে চড়ে তার সু অথাৎ স্বামী স্রোতাস্বিনীর সাথে রতিক্রিয়াতে মিলন হেতু তার শশুরালয় স্রোতাস্বিনীতে যাবে। জীব সৃষ্টির উৎস বা আধার পঞ্চভূত। টু উদ্ভিদজ অতএব উদ্ভিদ টু এর সৃষ্টির উৎস অথবা আধার ও পঞ্চভূত। অপরদিকে টু এর সু ও পঞ্চভূত কারণ পঞ্চভূতের সমাহারে মিলন ব্যতীরেকে টু এর অঙ্কুর উদগত হয় না। বহু পরীক্ষা - নিরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞান সম্মত-ভাবে কুড়মি জাতি একমাত্র স্রোতস্বিনীকে পঞ্চভূত সমাহারের প্রমাণ পেয়েছিল। তাই টু এর সু ও স্রোতস্বিনী এবং শশুরালয় ও স্রোতস্বিনী।

উদ্ধৃত উক্তিটি আধারে মকর পরবের বা টুসু পরবের একটি টুসু গিতে প্রমাণ পাওয়া যায় স্রোতস্বিনীই টু এর শশুরালয়। গিতটি হলো ঃ- পাঁনিই(জলে) হেলন, পানিই খেলন। পানিই তহর কন আহে? আপন মনে ভাবি দেখা। পানিই হামর শশুরঘর আহে। গীতটির বাংলা ভাষাতে ভাষান্তর হচ্ছে জলে অবগাহন কর, জলে খেলা কর। জলে তোমার কে আছে? আপন মনে ভেবে দেখ, জলে আমার শশুরঘর আছে।।

পুরুষ, প্রকৃতির মিলন ব্যতীরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। এক্ষেত্রে সু অর্থাৎ পুরুষ স্রোতস্বিনী এবং টু অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ঠ ধান শস্য দানা অর্থাৎ প্রকৃতি। এই দুয়ের মিলন ব্যতীরেকে অঙ্কুর উদগত হওয়া অসম্ভব। তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে তান্ত্রিক কুড়মি জাতি প্রমান পেয়েছিল পঞ্চভূতের দৃশ্য, স্পৃশ্য ক্ষিতী, অপ এবং অনুভূত তেজের অধ্যাংশ পিতৃস্বত্বা অর্থাৎ পুরুষ এবং অনুমেয় মরুৎ, ব্যোম এবং তেজের অধাংশ মাতস্বতা অর্থাৎ প্রকৃতি। পুরুষ, প্রকৃতির এইরূপ মিলনে জীব সৃষ্টির উৎস পঞ্চভূতে জীবের সৃষ্টি। টুসুর মধ্যে তেজের মাত্রা বিষয়ে সন্দেহ থাকার কারণে

টুসুকে সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শে আনার উদ্দেশ্যে টুসুর যান চউড়ল অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ কল্পনা করা হয়েছে।

এইভাবে টুসু সৃষ্টি গুণে গুণ সম্পন্না। সৃষ্টিশীলা। তাই টুসু গীতে বলা হয়েছে -

এক সড়পে, দুই সড়পে, তিন সড়পে লক চলই।

হামর টুসু, মঁইধে চলই

বিন বাসাতে গাত ডলই।।

গীতটিতে সড়প ত্রয়ের ভাবার্থ ত্রিগুণ অর্থাৎ স্বত্ব, রজ এবং তম। স্বত্ব গুণে স্থিতি, রজ গুণে সৃষ্টি এবং তমগুণে লয়। আমাদের টুসু মধ্য গুণে অর্থাৎ রজগুণে অর্থাৎ সৃষ্টিগুণে চলে।

যেহেতু কৃষি স্রষ্টা কৃষিজীবি কৃষক কুড়মি জাতির আদরের টুসু রজ গুণে অর্থাৎ সৃষ্টি গুণে চলে তাই চার দিন ব্যাপী মকর পরবে কুড়মি জাতি রজগুণোদ্দীপক আহার্য বস্তু যেমন নানা প্রণালীতে তৈরী নানা প্রকারের পিঠা, দধি, গুড়, চিড়া, মুড়ি এবং মাত্রাধিক পরিমানে মাংস ইত্যাদির পরিপাটি করে তাই তো কুড়মালি সংস্কৃতির মরমিআ কবি গেয়ে গেছেন 'মাস, পিঠা হবেক মকরে।' এক কথায় মকর পরব মানে খাওয়ার পরব। খেয়ে আনন্দে উপভোগ করার পরব। টুসু রজঃ গুনে চলা শুরু করেছে। অতএব সঠিক সময়ে ধান শস্য দানা অবশ্যই অঙ্কুরিত হবে। বর্ত্তমান বৎসরের ন্যায় আগামী বৎসর ও ধানের ফসল ফলানো সম্ভব হবে।

বঙ্গাব্দ বর্ষ গণনা অনুসারে কুড়মি জাতির কুড়মালি সংস্কৃতি বারো মাসে অবশ্য পালনীয় তেরো পরব সাধ্যমত ব্যাখ্যা করা হলো। তাতে প্রমাণ পাওয়া গেল সেগুলির সবকটি কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি আধারিত। শুধু তাই নয় কৃষি কর্মের উপকরণ সমূহের নাম এবং কৃষি উপযোগী জমির নাম ও কুড়মি জাতির মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দে নাম থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লিখিত তথ্য প্রমাণাদির দ্বারা তর্কাতীতভাবে বলা যায় কৃষি কর্মের উদ্ভাবক কুড়মি জাতি।

শরীরী সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি

প্রসঙ্গক্রমে কুড়মালি সংস্কৃতির প্রথম বিভাগ শরীরি সংস্কৃতির আগেভাগে আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতি বিবৃত হলো। এর পরে যদি বাকি দুই বিভাগ যথা ১) শরীরী সংস্কৃতি এবং ২) আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি আলোচিত না হয় তাহলে বিষয়টি অন্ধকারে থেকে যাবে। তাই প্রথম বিভাগ শরীরি বিভাগ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

শরীরী সংস্কৃতি—

মানুষ সচেতন জীব, তাই এদের মনের মধ্যে সততই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি বিষয়ে, জীব সৃষ্টি বিষয়ের ইতিহাস জানার কৌতুহল জাগৃত হতে থাকতো। কৃষিকর্ম উদ্ভাবক কুড়মি জাতি কৃষিকর্মের দ্বারা উদর পুরনের প্রধান আহার্য শস্য দানার অঙ্কুর উদগম থেকে পুনঃরায় শস্যদানা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও প্রকৃতির কার্য্যকারিতা কৃষিকর্মের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিল। সেই আধারে তারা পুরুষ ও প্রকৃতির আরাধনা, উপাসনা শুরু করে। পুরুষ ও প্রকৃতির আরাধনা, উপাসনার হাত ধরেই কুড়মি জাতি তনতঁত (তন্ত্র) সাধন পথের সন্ধান পেয়েছিল। তন এবং তঁত দুটো শব্দই কুড়মালি ভষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ। তনমানে দেহ বা গতর এবং তঁত মানে সন্ধান বাটউআ। যে সাধন পথে দেহ সৃষ্টির পূর্ব্বে দেহের অবস্থান, দেহ সৃষ্টির উপাদান এবং কারক থেকে শুরু করে দেহাবসানের পরবর্ত্তীকালের অবস্থা বিষয়ের সন্ধান দেয় তাকে তনতঁত পরবর্ত্তীকালে তন্ত্র সাধনা বলা হয়েছে।

তন্ত্র সাধনার নিয়মানুযায়ী কুড়মালি সংস্কৃতিতে কুড়মি জাতি গর্ভধারণকালে গর্ভবতীকে সধউড়ি খাউআউঅন বা সাধভক্ষণ করানো নামক একটি মাত্র সংস্কার পালন করা হয়। গর্ভ সঞ্চার হওয়া কাল থেকে সঞ্চারিত গর্ভের নয় মাস বয়স কালে গর্ভবতীকে পিত্রালয়ের চর্ব্য, চয্য, লেহ্য, পেয় সকল প্রকার আহার্য্য বস্তু বা গর্ভবতীর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকার এবং প্রসব করাকালে মানসিক মনোবল, শারীরিক শক্তি যোগানোর সাথে সাথে গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যত জীবনে মামাবাড়ীর কর্তব্য পালনের প্রতি দায়ীত্ব বোধের বীজ অন্তরে অঙ্কুরিত করা। এই সংস্কার পালনে গর্ভবতীর পিত্রালয়ের পুরুষ মানুষের এমন কি মাতৃ সম্পর্কিয়া নারী সমাজের উপস্থিতি অবৈধ। কেবলমাত্র আজিমাঁই (পিতার মাতা) দুধু মাঁই (মাতার মাতা) এবং ভউজাই (বৌদি) সম্পর্কিয়া রমনীগণ অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই বাধা-নিষেধের অন্তরালে যে গভীর গোপনীয়তা লুকিয়ে আছে তা হলো প্রসব করা কালে প্রসব করা যন্ত্রণাকে লাঘব করার জন্য তন্ত্রসাধন মার্গের মুদ্রার মাধ্যমে শ্বাস ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জরায়ুতে চাপ সৃষ্টি করা, যোনিদ্বার সম্প্রসারন করার জন্য পা এবং কোমরের ক্রিয়া ইত্যাদি গোপনীয় কৌশল নিজেরা করে গর্ভবতীকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিল তান্ত্রিক কুড়মি জাতি। আজি মাঁই, দুধু মাঁইদের কাছ থেকে যতটা নিঃসঙ্কোচ, লজ্জাহীনভাবে গর্ভবতী এই সব শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে তা অপরের কাছ থেকে হওয়া সম্ভব

গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশু গর্ভবতীর জরায়ুতে জলভরা থলিতে বদ্ধ থাকে। সেই জল যাতে মুখ, নাক, কান দিয়ে যেন ভিতরে ঢুকে না যায় প্রকৃতি তার ব্যবস্থা প্রথমেই করে দেয়। গর্ভাবস্থায় থাকাকালে গর্ভস্থ শিশুর মুখ, নাক, কান শ্লেষ্মা দিয়ে বদ্ধ থাকে এবং মুখ, নাক, কানের কাজগুলো শিশুর নাভির সহযোগে যুক্ত নল যা অপর প্রান্ত মাতৃ নাভির সাথে যুক্ত থাকে সেই নল দ্বারা শিশু খাদ্য, জল ও প্রাণ গ্রহণ করতে থাকে। গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ধাত্রীমাতা (ধাইমাঁই) শিশুর মুখ, নাক, কানের শ্লেষ্মার আস্তরণ পরিস্কার করে দেয়। অপরদিকে আঁতুড়ঘরে থাকা অপর রমনীগণ ঘরের ছাউনিতে আঘাত করে ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ শব্দে শিশুর শ্রবণ যন্ত্র এমন কি মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই প্রতিধবনির দ্বারা শিশুর শ্রবণ ক্রিয়া সঞ্চার করা হয়। সাথে সাথে জন্ম যন্ত্রণা হেতু অচৈতন্য শিশুকে চেতন করা হয়। এর আর একটি কারণ এই যে অতীতে প্রসব করা ক্রিয়াটা এতবেশি মারাত্মক ছিল যে বহু ক্ষেত্রে হয় প্রসূতির মৃত্যু ঘটতো না হয় শিশুর মৃত্যু ঘটতো আবার কখনো কখনো উভয়ের মৃত্যু ঘটতো। তাই কুড়মালি প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে ‘জাউআ জনম হেলেইক আর নাঁউআ জনমপাউলি’। ভূমিষ্ঠ সুস্বাস্থ্য শিশুর জন্মকে জাউআ জনম অর্থাৎ অঙ্কুরের সৃজন হওয়া বলা হয়েছে এবং নাউআ জনম পাউলি অর্থাৎ প্রসূতি নূতনভাবে প্রাণ লাভ করলো। এমতাবস্থাতে পরিবারের পুরুষ মানুষের উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক তাই তারা উৎকণ্ঠিত মনে আঁতুড় ঘরের অঙ্গনে সমবেত হয়ে উৎকণ্ঠাতে প্রহর গুণতে থাকে। ছাঁছাঢাড়হানোর শব্দের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে প্রসব হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়।

নাইর রেতা (নাড়ীচ্ছেদ) ঃ-

প্রাক্-বৈদিক যুগে ধাতু বা ধাতুর অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বকালে কুড়মি সমাজে ধাত্রীমাতা শুদ্ধ ঝিনুক দিয়ে ভূমিষ্ঠ শিশুর নাড়ীচ্ছেদ করা প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে লৌহ যুগে এমন কি বর্ত্তমানে ও লৌহ নির্মিত শোধিত তীরের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে ঘর্ষণ করে (রেতিকন) নাড়ীচ্ছেদ করা প্রথা প্রচলিত আছে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে ছেদন করা নাড়ী যত্রতত্র ফেলে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত নাই। ঘরের মধ্যে গর্ত খনন করে তার মধ্যে পুঁতে সংরক্ষণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাই কুড়মালি প্রবাদ বাক্যে বলা হয় “ এহে টিঁড়হাঁই মর নাইর গাড়ালাহি। অর্থাৎ এই ভিটেতে আমার নাড়ি পোতা আছে। তাই এই সংস্কারটি নাইর গাড়া নামে পরিচিত।

গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশুর সুরক্ষার জন্য প্রকৃতি মাতা শ্লেষ্মার আস্তরণ দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ধাইমা সেই আস্তরণ পরিস্কার করার জন্য যে দ্রব্যাদি প্রয়োগ করেন সেগুলি বর্তমান যুগে হাস্যস্কর হলে ও বিজ্ঞান সম্মত। দ্রব্যাদি ১) মুসা মাটিক গুড়ি (বৃহৎ শ্রেণীর ইঁদুরকে মুসা বলা হয়, সেই ইঁদুর মুখ দিয়ে গর্ত খনন করার জন্য মাটি

বাহির করে অর্থাৎ মুসার মুখের লাল মিশ্রিত মাটির মিহি চূর্ণ।) ২) ছাগেইরকর সুখল লাদাড়িক গুড়ি (ছাগলের প্রধান আহার্য বস্তু বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা এবং ঘাস, তা দিয়ে তৈরী মলের মিহিচূর্ণ।৩) চুলহা মটিক গুড়ি (উনানের ভিতর অংশ যা জ্বালানি কাঠের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে লাল রং ধারণ করে সেই মাটি চূর্ণ)। ৪) সূখল হেরেইদ গুঁড়ি (শুকনো হলুদের চূর্ণ)। ৫) পাটরা খুঁড়হা (চালকে পুনঃরায় ঢেঁকি দিয়ে ছাঁটার সময় যে তুষ বাহির হয় তার মিহি চূর্ণ) ৬) আরুআ চাউরেক গুড়ি (আতপ চালের মিহি চূর্ণ)। শোধিত এবং পরিস্কার মিহি পাতলা কাপড়ে সমস্ত চূর্ণকে ছেনে নেওয়ার পর যে অতিমিহি চূর্ণ বাহির হয় সেই চূর্ণ ভূমিষ্ট শিশুর শরীরে মাখিয়ে আস্তরণ পরিস্কার করা হয়। তারপর ইষদ উষ্ণ জল দিয়ে মোছার পর শোধিত এবং পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে পরিস্কার করা হয়।

সইলতাঁই দুধ পিআউঅন (সলতেতে দুগ্ধ পান করানো) ঃ-

সদ্যজাত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানো হয় না। ছাদদুগ্ধ পান করানো হয়। পান করানোর পদ্ধতিটা ও বেশ অভিনব। পরিস্কার এবং শোধিত পাতলা নেকড়ার সলতে পাকিয়ে সেটাকে ছাগদুগ্ধে চুবিয়ে ভেজানো হয়। সেই সলতের একপ্রান্ত শিশুর মুখে দেওয়া হয়। শিশু মাত্রামাফিক পরিমানে দুগ্ধ পান করার সুযোগ পায় এবং চোষন করা কৌশল আয়ত্ত করে।

কুড়থি পানি পিআউঅন (কুড়থি জল পান করানো) ঃ-

এক প্রকার তৃণ। কুড়মি জাতি কৃষিকর্মের দ্বারা কুড়থি উৎপাদন করে এবং ডালরূপে ব্যবহার করে। কুড়মি সমাজে প্রসূতিকে প্রসব করার দিন এবং তারপর দিন দুই এক কোয়া কাঁচা রসুন, খুবই কম পরিমানে হলুদ এবং ঈষদ উষ্ণ জল ব্যতীরেকে অন্য কোনও আহার দেওয়া হয় না তৃতীয় দিবসে সর্বপ্রথম সেদ্ধ কুড়থির জল পান করানো হয়। তারপর সেদ্ধ কুড়থি, চিড়ে ইত্যাদি সহজপাচ্য আহার দেওয়ার পর ভাতের পথ্য দেওয়া হয়। কুড়মি সমাজে শিশুর অন্নপ্রাশন কাল পর্যন্ত প্রসূতিকে খাদ্যদ্যাদ্যে বহু বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

নউ দিনেক দিনে নারতা বেজুইতে ছউদিনেক দিনে ছেঠি (নবম দিবসে নরতা ব্যতীক্রমে ষষ্ঠ দিবসে ছেঠি) ঃ-

নারতা - নাইররেতা শব্দ থেকে নারতা শব্দটি গঠিত হয়েছে। নাইর এবং রেতা শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে নাইররেতা শব্দটি গঠিত হয়েছে। উক্ত শব্দদ্বয় কুড়মালি ভাষার শব্দ। নাইর শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ নাড়ী এবং রেতা শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ ঘর্ষণ করা। নাড়ীর যে প্রান্তটি শিশুর নাভির সাথে যুক্ত থাকে ধাত্রীমাতা সেই প্রান্তটি কোপ মেরে ছেদন করে না ঘর্ষণ করে ছেদন করে তাই তাকে নাইর রেতাবলা হয়েছে।

ছেঠি - বাংলা ভাষার ছিঁড়া বা ছেঁড়া যার অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া সেই ছিঁড়া বা ছেঁড়া শব্দের কুড়মালি ভাষাতে প্রতিশব্দ ছিঁটন বা ছিঁটা। নাড়ীর যে প্রান্তটি প্রসূতির হৃদয়ের সাথে যুক্ত থাকে সেই প্রান্তটি প্রাকৃতিক নিয়মে আপনাআপনি ছিঁড়ে যায় (পরকিতিআধচরে আপনে

ছিঁটেইক)। তাই তাকে ছিটা বলা হয়। ছিটা শব্দ থেকে ছেঠি শব্দ গঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। একটি ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পন্ন হয়। অপরটি মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। তাই নামের ভিন্নতা কিন্তু নেগ-চার, নিয়ম-নীতি পালনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকে না। কুড়মালি সংস্কৃতিতে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অর্থাৎ জাত হওয়ার দিন থেকে নবম দিসবে নারতা সংস্কার (চার) পালনের মাধ্যমে জাতাশৌচ মুক্ত হওয়ার প্রবনতা কুড়মি সমাজে অধিক মাত্রায় দেখা যায়। অখন্ডনীয় বাধা-নিষেধের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ দিবসে ছেঠি সংস্কার পালনের মাধ্যমে জাতাশৌচ মুক্ত হওয়ার বিধান কুড়মালি সংস্কৃতিতে স্বীকৃত আছে। জাতাশৌচ থাকাকালে কুড়মি জাতি নখ কাটে না, চুল ছাঁটে না দাড়ি কামাই না। কিন্তু আমিষ ভক্ষণে নিষেধ থাকে না। তাই এই অশৌচটাকে কুড়মালি ভাষাতে ' দাড়হি ছুইত হেলাহি ছাঁড়ি ছুইত নহি' বলা হয়।

নারতা (নরতা) বা ছেঠি সংস্কারের নিয়ম-সংস্কার (নেগ-চার) ঃ-

নরতা অথবা ছেঠির দিন সকাল বেলা-নাপিত বাড়ীতে এসে গৃহকর্ত্তার আদেশ অনুযায়ী গুসটির অন্তর্গত সকল পরিবারকে, পাড়া-পড়শি, প্রতিবেশী (অড়-পড়শি) সকল পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নরতা কামানোর এবং নবজাত শিশুর নামকরণ করার উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করে। অপরদিকে নাপিতানী নরতা কামানোর তেল বসিয়ে (স্থাপন করে) গৃহকত্রীর নখ কেটে পায়ে আলতা পরিয়ে মহিলা মহলের নরতা কামানোর ক্রিয়ার সূচনা করে। নাপিত গৃহকর্ত্তার নখ কেটে, চুল ছেঁটে, দাড়ি কামিয়ে পুরুষ মহলকে কামানোর সূচনা করে। অনুরূপভাবে ধোপিনী গুসটির অন্তর্গত সকল পরিবার থেকে কমপক্ষে একখানা বস্ত্র সংগ্রহ করে এবং প্রসূতির ব্যবহার করা সকল বস্ত্র খারে(ছাইত্র) কেচে শুকিয়ে যথাযথ ফেরত দেয়। ধাত্রীমাতা প্রসুতিকে এবং নবজাতকে সর্বপ্রথম আঁতড়ঘর থেকে বের করে নাপিতানী এবং নাপিতের সমক্ষে এনে প্রসূতিকে নাপিতানীর নিকট নখ কাটানো, পায়ে আলতা পরানো এবং নবজাতককে নাপিতের নিকট মাথা মুন্ডন করা ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তারপর প্রসূতিকে স্নান করিয়ে প্রসূতির পিত্রালয়ের দেওয়া নববস্ত্র পরানো হয়। অপরদিকে ধাত্রীমাতা হলুদ চুর্ণ, চালের চুর্ণ মাখিয়ে ঈশদউষ্ণ জলে স্নান করায়। তারপর পিসি কাজল পরিয়ে দেয়। তারপর শিশুকে তার মামাবাড়ীর অর্থাৎ প্রসূতির পিত্রালয়ের দেওয়া শয্যাতে শোয়ানো হয়। এতৎকারণে শিশুর পিসি বাড়ীতে এবং মামাবাড়ীতে নরতা বা ছেঠি উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করা বাধ্যমূলক। কুড়মি সমাজে এই নিমন্ত্রণ পাঠানোর পদ্ধতিটা ও অদ্ভুত । নিমন্ত্রণের বার্তা বহন করার অধিকার একমাত্র ধাত্রীমাতার । প্রসূতির জেইড়সাস (স্বামীর দিদি) ননদ (স্বামীর বোন) এবং ভউজাই (দাদা এবং ভাইয়ের স্ত্রী) সকলকে শিশুর জাউআজনম হওয়া এবং প্রসূতির নাউআ জনম হওয়ার ঘটনা প্রবাহের বার্তা দেয় এবং বিনিময়ে সে পেয়ে থাকে। এই নিমন্ত্রন বিতরণকে ধাউআ বুলানো বলা হয়।

নামকরণ করা ঃ-

সকাল বেলা নরতা বা ছেঠি কামানোর পর সন্ধ্যাতে পুনঃরায় সকলে সমবেত হয়ে খাওয়া-দাউআর পাট চুকিয়ে সর্বসম্মতভাবে শিশুর নামকরণ করা হয়। এইভাবে নরতা

কামানো এবং নামকরণ করার মানবেচিত সংস্কার সম্পন্ন করার পর আধ্যাত্মিক বিষয়ক সংস্কারের সূচনা করা হয়। যেমন আঁতুড়ঘরে ধুনা পুড়িয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রসূতি এবং নবজাতককে নিরিবিলি এককভাবে সারা রাত ব্যাপী ঘরের দরজা সম্পূর্ণ খোলা রেখে শোয়ানো হয়। এর উদ্দেশ্য ঐ রাত বুড়হাবাবা নির্বিঘ্নে আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করে নবজাতকের কপালে ভাগ্যলিপি লিখন লেখেন। সারনা ধর্মে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে দেব মন্ডল সংখ্যাতে মাত্র নবম। যথা ঃ- ১) বঁগা (বম+গ) মহাশূন্য ২) বাঘুত (বাক+ভুত) বায়ু দেবতা ৩) বানসিন (বান মানে জল + সিন মানে দেবতা) জল দেবতা ৪) ধরম ঠাকুর (সূর্য্যদেব) তাপ দেবতা ৫) বুড়হা বাবা (পুরুষ) ৬) মাঁহাঁমাঁই (প্রকৃতিমাতা এবং বসমতামাঁই) ৭) চাঁদঅরাই (শীতলতা) ৮) গরাম ঠাকুর (কৃষি কর্মের সহায়ক উপাদান প্রদানকারী এবং রোগ ব্যাধি প্রতিরোধক দেবতা) ৯) গঁসাই রাই (পাহাড়-পর্ব্বতের দ্বাররক্ষক দেবতা) উক্ত নবম দেবমন্ডলের কৃপাদৃষ্টি নবজাতকের কপালে অহরহ নিক্ষেপিত হতে থাকা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয় তাই নবম দিবসে নরতা পালন সংস্কার কুড়মালি সংস্কৃতিতে স্বীকৃত এবং প্রচলিত আছে।

একুইশা ঃ-

এই সংস্কারটি নবজাতকের একুশ দিন বয়স কালে পালন করা হয় তাই একুশা বলা হয়। এর অপর নাম ডাবনা। এটি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্মত সংস্কার। তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে কুড়মি জাতি উপলব্ধি করেছিল, শরীরে রোগের আক্রমণের উৎসস্থল পেট। তাই তারা স্থায়ীভাবে পেট নিরাময় রাখার উদ্দ্যেশে বিশেষ করে পীলহাকে নিরোগী রাখার উদ্দ্যেশে নবজাতকের একুশ দিন বয়সে ডাবনা দেওয়া সংস্কার পালন করে। এই দিন ধাত্রীমাতা সকাল বেলা ঘুঁটের গনগনে আগুনের উত্তাপে কাস্তের অগ্রভাগকে অঙ্গার সদৃশ্য উত্তপ্ত করে নবজাতকের খালি পেটে তেল মালিশ করে গোটা পেটে উত্তপ্ত কাস্তের অগ্রভাগ ছুঁইয়ে ছেঁকা দেয়। একে ডাবনা দেওয়া বলা হয়।

অন্নপ্রাশন (মুঁজুঁঠান) ঃ-

সারনা ধর্মে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে পুরুষ শিশুর ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাস বয়সে এবং স্ত্রী শিশুর পঞ্চম অথবা সপ্তম মাস বয়সে অন্নপ্রাশন সংস্কার পালন করা হয়। তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে কুড়মি জাতি প্রমান পেয়েছিল পুরুষ শিশুর ষষ্ঠ মাস বয়সে এবং স্ত্রী শিশুর পঞ্চম মাস বয়সে সহজ পাচ্য পার্থিব খাদ্য বস্তু হজম করার পাচন ক্রিয়া যন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। মাতৃদুগ্ধ এবং মাতৃদুগ্ধবৎ প্রাকৃত বস্তু খাওয়াতে মুখে এঁঠো হয় না(মুঁজুঠাইকনিঁহিঁ)। পার্থিব খাদ্য বস্তু খাওয়াতে মুখ এঁটো হয়। অথচ শিশুর উক্ত বয়স হওয়া কালে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ সংগ্রহ হওয়া ক্রিয়া হ্রাসপায়। অপর দিকে শিশুর অধিক আহারের চাহিদা বাড়তে থাকে। এমতাবস্থাতে শিশুকে পার্থিব আহার খাওয়াতে বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। তাই মুঁজুঁঠান বা অন্নপ্রাশন সংস্কারের মাধ্যমে শিশুকে পার্থিব আহার্য বস্তু খাওয়ানোর পথ প্রশস্ত করা হয়।

যেহেতু শিশুর মামীমা মাসিমা, পিসিমাদের মুঁজুঁঠান সংস্কারে উপস্থিত থেকে শিশুর

মুখে ভাত দেওয়া অতি অবশ্যকরণীয় তাই তাদেরকে আমন্ত্রণ করার সাথে সাথে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, হিত-মিতান, সঁগি সাথীকে ও আমন্ত্রণ করা হয়। ফলতঃ কুড়মি সমাজে মুঁজুঠান সংস্কারটি মহাধুমধাম সহকারে পালন করা হয়।

সংস্কার পালনের নিয়ম ঃ- সকালবেলা ঘর-দ্বোর, অঙ্গন, তুলসী টিবি ধুইয়ে মুছে পরিস্কার করা হয়। শিশুর মাতা স্নান সেরে নববস্ত্র পরিধান করে নতুন অথবা শুদ্ধ উনানে নুতন পাত্রে মুঁজুঠানের (অন্নপ্রশাসনের) জাউড়িভাত (পায়েস) রান্না করে। আজিমা শুদ্ধ শান্ত চিত্তে প্রথমে তুলসী টিবিতে রান্না করা জাউড়ি ভোগ চড়ান। তারপর শিশুকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে পূর্ব মুখে বসানো হয়। প্রথমে শিশুকে ধান স্পর্শ করানো হয়। তারপর ধান মাপক যন্ত্রের সাথে বর্ত্তমানে লেখাপড়ার উপকরণ স্পর্শ করানো হয়। তারপর বুড়হাবাবা মাঁহামাঁইএঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে শিশুর মুখে তিন গ্রাস ভাত দেওয়া হয়।

বিবাহ (বিহা)ঃ-

সারনা ধর্মে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিবাহ সংস্কার অন্যতম প্রধান সংস্কার। যেহেতু আলোচ্য বিষয়টি কুড়মালি সংস্কৃতি বিষয়ক তাই কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি আধারে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কুড়মালি ভাষার বহা শব্দ থেকে বিহা শব্দটির উৎপত্তি। বহা শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ বহন করা। অতএব আমাদেরকে খুঁজতে হবে কে, কার, কোন ভার বহন করে। বর এবং কনে (বর আর কেনিআঁহি) শব্দদ্বয়ের সাথে বিহা শব্দটি এমনভাবে জড়িত যে বর এবং কনে ব্যতীরেকে বিহা শব্দটির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে বর-কনে সেখানে বিহা। যেখানে বিহা সেখানে বর-কনে। বিহার সস্কারের মাধ্যমে বর কনের জঠর ক্ষুধা নিবৃত্তির ভার বহন করে। অপরদিকে কনে বরের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির মাধ্যমে বংশবদ্ধি করার ভার বহন করে। বর এবং কনে উভয়ে উভয়ের উভয় ভার বহা অথবা বহন করার নাম বিহা। সারনা ধর্মে স্বগুস্টিতে বিহা (বিবাহ) নিষিদ্ধ। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। বরং তৎপরিবর্তে নেগে নেগে নেগি বিহাগিত গাহার চলন চালু আছে। কুড়মি সমাজে ছেলে-মেয়ের বিহার (বিহারের) বয়স সীমা পহনা উমেইর বাংলা ভাষাতে কিশোর বয়স নির্ধারণ করা আছে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে চার প্রকারের বিহার (বিবাহের) প্রথম স্বীকৃত এবং প্রচলিত আছে। যথাঃ- ১) পিঁড়হা বিহা ২) জুঁ আঁইট (জোয়াল) বিহা ৩) কাইরা বিহা ৪) বেঁধখাড়হি বিহা। এই চার প্রকারের বিবাহতেই (বিহাইএঁ) হাঁড়ি বিহা নেগ পালন অনিবার্য। তাই কুড়মালি সংস্কৃতির মতাবলম্বী বিহাকে হাঁড়ি বিহা বলা হয়।

১) পিঁড়হা বিহা ঃ- এই বিহাতে কনেকে মহুয়া কাঠের পিঁড়হাতে বসিয়ে কনে বরণ, লগন প্রদান এবং সিঁদরাদান অর্থাৎ মাথাতে সিঁদুর দেওয়া হয়। এই বিয়েতে ও হাঁড়ি বিহা নেগ অনিবার্যভাবে পালিত হয়।

২) জুঁআঁইট বিহা ঃ- প্রাকৃতিক নিয়মের হেরফেরে অথবা কিশোর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে কনে যদি বিয়ের পূর্ব্বে ঋতুস্নান করে অর্থাৎ ঋতু স্নাতা কনেকে মহুয়া কাঠের পিঁড়হার

পরিবর্তে মহুয়া কাঠের জোয়ালে বসিয়ে বিহা দেওয়া হয়। এ বিয়েতে ও হাড়ি বিহা নেগ পালিত হয়।

৩) কাইরা বিহা ঃ- কাইরা শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষাতে শব্দটির প্রতিশব্দ কলা অথবা কদলি। কাইরা বিহা নামকরণে কারণ বর যদি কুমার অর্থাৎ অবিবাহিত হয় এবং কনে যদি বিবাহিতা অর্থাৎ বিধবা কিম্বা বিবাহ বিচ্ছেদা হয় সেক্ষেত্রে উভয়কে সমশ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে কুমারী শ্রেণীভুক্ত করা যেমন অসম্ভব এবং বিধিবহির্ভুত তেমনি বিয়ের পিঁড়িতে বসানো অর্থাৎ বিয়ে দেওয়াও বিধিবহির্ভুত, অসম্ভব। অপরদিকে কুমার বরকে কাইরা গাছের (কলা গাছের) সাথে বিয়ে দিয়ে তার কুমারত্বের বিলোপ ঘটিয়ে বিবাহিতের শ্রেণীভক্ত করার পথ প্রশস্ত এবং সম্ভব করার দার্শনিক যুক্তিকুড়মালি সংস্কৃতিতে স্বীকৃত। এই নিয়ম এবং বিধি-বিধান যদি কুড়মালি সংস্কৃতিতে স্বীকৃত না হতো তাহলে কুড়মি সমাজের বিধবা এবং বিবাহবিচ্ছেদা স্ত্রী জাতির ক্ষেত্রে বিবাহ সংস্কারটি অভিশাপে পরিণত হতো, নারী জন্ম বিফল হতো।

কুড়মালি সংস্কৃতির সমস্ত নেগ-চার অর্থাৎ নিয়ম সংস্কার মেনে বরকে কাইরা গাছের সাথে বিহা করিয়ে বরকে ও বিবাহিতের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এ বিয়েতে ও হাঁড়ি বিহা অনিবার্য। যেহেতু বর ও কনে সমশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ বিবাহিতের শ্রেণীভুক্ত অতএব কুড়মি সমাজে স্বীকৃত এবং প্রচলিত সাঁঘা সংস্কারের নেগে-চারে বরও কনের মিলন ঘটানো হয়। যেহেতু বর প্রথমে কাইরা গাছকে বিয়ে করে তাই এই বিয়েকে কাইরা বিহা বলা হয়।

যেহেতু কনে বিবাহিতা তাই বরকেও বিবাহিতের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু কুমারী কনেকে বিবাহিত বর নির্বিঘ্নে বিবাহ করতে পারে অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ একাধিকবার বিবাহ করার অধিকারে অধিকারী। কিন্তু নারী জীবনে মাত্র একবার বিবাহ করার অধিকারে অধিকারী। এই বৈষম্যের বিধি সম্মত কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সারনা ধর্মে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে রেবার সংস্কার পালনের সময় বর ও কনের অতীতে মামা বর্তমানে কাকা সমাজের কাছে বর ও কনের বাবার নাম এবং গুসটি উল্লেখ করে বেটা অর্থাৎ পুত্র এবং বেটি অর্থাৎ কন্যা হারাহারি হওয়ার অর্থাৎ দান এবং গ্রহণ করার বাজিতে উভয়েই উভয়ের কাছে পরাজিত হওয়া স্বীকার করে। বাংলা ভাষার 'পরাজয়' এবং কুড়মালি ভাষার 'হারা' এই দুটো শব্দেরই কুড়মালি ভাষার রবঅ শব্দটি একটি প্রতিশব্দ। এই শব্দ রবঅ থেকেই রেবার শব্দটীর উৎপত্তি। পিঁধান-অড়হান সংস্কার পালনের সময় বরের বাবা কনেকে নববস্ত্র পরিয়ে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে কনেকে তার বাবার গুসটি বদল করে নিজ গুসটিভুক্ত করে পুতউহু অর্থাৎ পুত্রবধু রূপে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বরের গুসটি বদল বা পরিবর্ত্তন হয় না কিন্তু কনে তার বাবার গুসটি পরিবর্তন করে শ্বশুরের গুসটিভুক্ত হয়। যেহেতু বর আজীবন স্বগুসটিভুক্ত থাকার অধিকারে অধিকারী তাই সে একাধিকবার বিয়ে করার অধিকারে অধিকারী। কিন্তু কনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়। নারী বিধবা অথবা বিবাহ বিচ্ছেদা হওয়ার পর ও সে তার

শশুরের গুসটি ভুক্ত থাকার অধিকারে অধিকারী। পিতা কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার অধিকারে অধিকারী। কিন্তু শশুর পুত্রবধূকে বিয়ে দোয়ার অধিকারে অধিকারী নন। অতএব বিধবা অথবা বিবাহ বিচ্ছেদা নারীকে পুনঃরায় বিয়ে দেওয়ার অধিকারে কেহ অধিকারী নয়। তাই তার একাধিকবার বিয়ে করার পথ অবরুদ্ধ। বিধবা এবং বিবাহ বিচ্ছেদা নারীর জীবন এই গভীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতে অবস্থান করে। উন্নতমানের মননশীল ক্ষমতাসম্পন্ন কুড়মি জাতি বিধবা এবং বিবাহ বিচ্ছেদা নারীর এহেন সঙ্কটের চিন্তায় চিন্তিত হয়ে উক্ত সঙ্কটমোচনার্থে কুড়মি সমাজে সাঁঘা প্রথার প্রচলন করে। সাঁঘার মাধ্যমে জীবনসাথী স্বামী প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত এবং পরিস্কার করে। তাদের নারী জন্মের সফল প্রাপ্তির পথ উন্মোচন করে। আমার মনে হয় সঁঘা শব্দ থেকে সাঁঘা শব্দটির উৎপত্তি। পাহাড়ের দুপাশে দুটো উঁচু চুড়া বা শিখরের মাঝখানে যে নালার মত নীচু ঢাল থাকে তাকে সঁঘা বলা হয়।। বিধবা এবং বিবাহ বিচ্ছেদা নারীর পাহাড়ের শিখর সদৃশ্য একদিকে পিতৃকুল অপরদিকে শ্বশুরকুল দুটোই বর্ত্তমান। কিন্তু কারুরই তাকে বিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকে না। সে পাহাড়ের নীচু ঢাল সঁঘা সদৃশ। স্বামী প্রাপ্তির মাধ্যমে সঁঘাকে ভরাট করার নাম সাঁঘা। সাঁঘাতে পিতৃকুলকে কিম্বা প্রাক্তণ শ্বশুর কূলকে কোনও ব্যয় ভার বহন করতে হয় না। এমন কি কোন ও নেগ - চার ও পালন করতে হয় না। তাই তো প্রবাদে বলা হয়েছে " ধেরি বাঁধি বিহা / মন সউদা সাঁঘা"।

৪) বেঁধখাড়হি বিহা ঃ- আরণ্যক জীবনযাপন কালে দাবানলের অগ্ন্যুৎপাতের কারণে পশুবৎ মনুষ্যজাতি একজঙ্গল থেকে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করতো। সেই কালে আগুন মনুষ্যজাতির অভিশাপ ছিল। উক্ত দাবানলের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কুড়মি নামে পরিচিত দলটি লক্ষ্য করিছিল, শুকনো দুটো কাঠ পরস্পর পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের কারণে আগুনের সৃষ্টি হয়। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে উক্ত দলটি আগুনকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য খুশীমত উৎপন্ন এবং নির্বাপন করার কৌশল করায়ত্ত করেছিল। অভিশাপের পরিবর্তে আগুনকে মনুষ্যজাতির আশীর্ব্বাদে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করেছিল। কুড়মি নামক দলটি যে মনুষ্য সমাজে আগুনের প্রচলন ঘটানোর স্রষ্টা তার প্রমাণে বলা যায় নব্যযুগে কৃত্রিম উপায়ে আগুন উৎপন্ন করার বহুবিধ উপায় সৃষ্টি হওয়ার পরও কুড়মি জাতি আদিকালের বেঁধখাড়হির অথবা কাঁড়কাঠির ব্যবহার পরিত্যাগ করেনি। পাথরে পাথরে ঠোঁকাঠুঁকি করে আগুন উৎপন্ন করার চকমকি পাথরের ব্যবহার ভোলেনি। শুকনো খড়কে মোটা করে পাক খাইয়ে তার মধ্যে অগ্নি সংযোগ করে তাতে অগ্নি সংরক্ষণ এবং যত্রতত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি ভোলেনি। কুড়মালি ভাষাতে একে বুঁদি বলা হয়। একজনের বাড়ির উনান থেকে অপর জনের বাড়ির উনান জ্বালানোর জন্য শুকনো খড়ের ছোট আঁটিতে করে আগুন বহন করে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি ভোলেনি। কুড়মালি ভাষাতে একে উকা বলা হয়। সর্বোপরি বিবাহ সংস্কারের মত সংস্কারে বেঁধখাড়হি নামকরণটি সর্ববলিষ্ঠ প্রমাণ।

মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে কুড়মিজাতি যে কৌশল অবলম্বন করে আগুন উৎপন্ন করেছিল

সেই কৌশলেতে ব্যবহৃত কাষ্ঠ দন্ড দুটির নাম বেঁধখাড়হি। দাবানলের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে কুড়মি জাতি প্রমাণ পেয়েছিল শুকনো দুটো কাঠের পরস্পর পরস্পরের সাথে ঘর্ষনের ফলে আগুন উৎপন্ন হয়। সেই পথ অনুসরণ করে মুষ্ঠিবদ্ধ হওয়ার মত মোটা দু টুকরো করে শুকনো কাঠের দন্ড অর্থাৎ কাঠির দ্বারা তারা আগুন উৎপন্ন করার চেষ্টা করেছিল। এক টুকরোটিকে মাটিতে রেখে অপর টুকরোটিকে সোজাসুজি তার উপরেস্থাপন করে হাতের তালুর দ্বারা অবিরাম ঘুরপাক খাইয়ে ঘর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। যে খন্ডটিকে সোজাসুজি উপরে স্থাপন করা হয় সেটিকে একই বিন্দুতে রাখার জন্য শোয়ানো খন্ডটির মধ্যে একটি বিঁধি বাংলা ভাষাতে ছিদ্র করা হয়। কুড়মালি ভাষাতে এই খন্ডটিকে ঢাইড় বলা হয়। বাংলা ভাষাতে এর প্রতিশব্দ মাতৃত্বলাভ করা নারী। যে খন্ডটিকে সোজাসুজি বিঁধের মধ্যে অর্থাৎ ছিদ্রের মধ্যে স্থাপন করে ঘর্ষণ সৃষ্টি করা হয় সেই খন্ডটিকে সাঁড়হা বলা হয়। সাঁড়হা শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ পূর্ণযৌপন প্রাপ্ত পুরুষ। এক্ষেত্রে ঢাইড় এবং সাঁড়হা দুটোই শুকনো সরু কাঠের খাঁড়া অর্থাৎ টুকরা বা খন্ড। কুড়মালি ভাষাতে বস্তুর ক্ষুদ্রাকার বস্তু স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বস্তু হয়। যেমন ঃ- ডুবা-ডুবি, ছিপা-ছিপি ইত্যাদি। তৎসূত্রে খাঁড়া থেকে খাড়হি। ঢাইড়টিতে বিধ থাকে তাই ঢাইড় সাঁড়হার সমন্বয় ঘটিয়ে আদিকালে নামকরণ করা হয়েছিল বিঁধখাড়হি। পরবর্ত্তীকালে বিঁধখাড়হি শব্দের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বেঁধখাড়হিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রশ্নের সম্ভাবনা এই যে তৎকালে মনুষ্য জাতিপাথরের ব্যবহার জানতো না, অন্যান্য অস্ত্রের কল্পনা সূদূর অস্ত। এমতাবস্থাতে খাড়হি ছিদ্র করা কোন উপায়ে সম্ভব হলো। তীক্ষ্ম বুদ্ধিধর কুড়মি জাতি তার বহু আগে উপায় আবিস্কার করেছিল। তাই তো তারা জলচল প্রাণী খখরিনের বাংলা ভাষাতে ঝিনুকের শুকনো খপলা বাংলা ভাষাতে খোলস দিয়ে নবজাত শিশুর নাড়ীচ্ছেদ ধাত্রীমাতাকে দিয়ে করাতো। এতএব ঝিনুকের শুকনো খোলস দিয়ে অতি সহজে খাড়হিতে বিঁধ করতো।

এতো আগুন উৎপন্ন করার গল্প হলো। এর সাথে বেঁধ খাড়হিবিহার সম্পর্ক কি? নামের সার্থকতা কতটুকু? আমার মনে হয় বেঁধখাড়হি বিহার পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে সম্পর্ক এবং সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে যে নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পককে ভালবেসে যৌন মিলনের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই অবৈধভাবে গোপনে দাম্পত্য জীবন উপভোগ করে তাদের উভয়ের পিতা অথবা অভিভাবক পরগনঁইতের নিকট তাদের ছেলে-মেয়ের কৃত অপরাধ স্বীকার করে সমাজে উঠার অর্থাৎ পুনঃরায় সমাজভুক্ত হওয়ার আবেদন করে। তাহলে পরগণঁইত উভয়ের গ্রাম মাহাতর সহায়তাতে কুড়মালি সংস্কৃতির স্বীকৃত সিদ্ধান্তে অর্থাৎ নেগে-চারে অর্থাৎ নিয়ম-সংস্কারে বিয়ে দেন। এই বিয়ে কে বেঁধখাড়হি বিহা বলা হয়। ব্যাখ্যয়িত বেঁধখাড়হি নামানুসারে বিয়ের নামকরণ করার যৌক্তিকতা বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে। এক্ষেত্রে বেঁধখাড়হির সাথে ভালবেসে দাম্পত্য জীবন উপভোগকারী নারী-পুরুষের সাদৃশ্য বিচার্য্য বিষয়। আগুনে প্রজ্বলিত হওয়ার উপাদান অবশ্যই কাঠের মধ্যে আছে। তাই তো কাঠ আগুনে

প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু আগুন সৃষ্টি করা কাঠের অর্থাৎ বেঁধ খড়হি ধর্ম নয়। তদ্রুপ নারী-পুরুষের হৃদয় মধ্যে যৌন ক্ষুধার তাড়না অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সামাজিক বিধি-বিধানকে তোয়াক্কা না করে আপন মর্জিমাফিক যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি করার পথ বেছে নেওয়া সামাজিক ধর্ম নয়, মানবিক ধর্ম নয়। এক্ষেত্রে বেঁধখাড়হি এবং অবৈধভাবে দাম্পত্য জীবন উপভোগকারী নারী-পুরুষ সমপর্যায়ভুক্ত। তাই উক্ত দম্পতির জীবনকে বৈধ করার জন্য যে বিবাহ পদ্ধতি স্বীকৃত হয়েছে সেই পদ্ধতির বিবাহকে বেঁধ খাড়হি বিহা বলা হয়েছে।

উক্ত চার প্রকার বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে কুড়মি সমাজের সকল শ্রেণীর বর কনের অর্থাৎ নারী-পুরুষের বিবাহ সংস্কার কুড়মালি সংস্কৃতির সংস্কার অনুসারে সম্পন্ন করা সম্ভব। এই চার প্রকার বিবাহকেই হাঁড়িবিহা বলা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতির এই হাঁড়িবিহা প্রধানত ষোলটি অতীব শুভ সংস্কার পালনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। তাই হাঁড়ি বিহা সংস্কার পালন পদ্ধতিকে সরসগুনে বিহা বলা হয়। ষোলটি অতীব শুভ সংস্কারগুলি যথাক্রমে ঃ- ১) ছিপাচাউর ২) রেবার অথবা বরতুক অথবা দু আইর গুঁহদা অথবা হাঁতবাঁহ ৩) লগন বাঁধা এইদবাস অর্থাৎ অধিবাস পালন দিনে পালনীয় শুভ সংস্কার ৪) খারছাড়ি ৫) মাড়ুআবাঁধা এবং মাড়ুআপূজা ৬) পুঁড়খুখড়ি পূজা ৭) পখেইর কড়া / ঘাট বাঁধা এবং ঘাট পূজা। ৮) নখ টুগান / সিনান / থুভড়াভাত খাউআ ৯) আম মউরা খাউঅন। কনে বাড়ীতে পৌঁছানোর পর প্রথম শুভ সংস্কার ১০) গুআটিকা ১১) ডুবাভাজন ১২) পিঁধাঁন-অড়হান ১৩) মহুআমউরা খাউঅন ১৪) হাঁড়ি বিহা / সালাধতি ১৫) সিঁদরাদান ১৬) পরছন।

উক্ত সরসগুন ব্যতীরেকে ও কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারে আরো প্রায় ১০টি অবশ্য পালনীয় সংস্কার করা হয়। কিন্তু যেহেতু সেগুলি সরসগুন পর্যায়ভুক্ত নয় তাই সেগুলির মাত্র নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। যথাঃ- ১) বরদেখা ২) অদউড়িপাড়া ৩) নিমছা ৪) গরামঠাকুরকে গড়লাগা ৫) চউকপুরা ৬) খিরখাউআ ৭) ঘারভরা ৮) চুমান ৯) ঘটি লুকা ১০) বানাসুনা। এতৎসত্বে ও সরসগুন নির্ধারণ করার আড়ালে নিশ্চয় কোন ও গভীর তত্ব লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকা স্বাভাবিক। তাই সেদিকে নজর ফেরানো উচিৎ। ক্ষেত্র বিশেষ হামেশাই একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য "যো ল কলাই পূর্ণ" শোনাযায়। এই কলা হয় চাঁদে। ষোল কলাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে চাঁদ। চাঁদের সাথে কুড়মালি সংস্কৃতি ওতোপ্রতভাবে জড়িত। মানুষ জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করে দাম্পত্য জীবন প্রাপ্তির মাধ্যমে। দাম্পত্য জীবন প্রাপ্তির পথ বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত হওয়া। যেহেতু মানুষ জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করে বিবাহ সংস্কারে তাই বিবাহ সংস্কার সরসগুন।

এক্ষেত্রে সরসগুনের বিশদ ব্যাখ্যাতে যাওয়া সম্ভব নয়। তথাপি অল্পবিস্তর আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ সরসগুনের নেগ-চার অর্থাৎ নিয়ম সংস্কার অতি প্রাচীন যুগীয় হওয়ার কারণে বর্ত্তমান যুগে সেগুলি তত্ত্ব বোঝা অতি কঠিন ঠেকে এবং নামগুলির ভাষা অতি প্রাচীন যুগীয় ঠেঁঠ কুড়মালি হওয়ার দরুন নামের সার্থকতা বিষয়ে ধোঁয়াশা থেকে

যায়। যেমন ঃ- ১) ছিপাচাউর ঃ- বর্ত্তমান যুগে ছিপা শব্দটির প্রচলন প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু শব্দটি কুড়মি সমাজে, কুড়মালি ভাষার অতিপ্রচলিত প্রাচীন শব্দ। ছিপা শব্দের অর্থ খাদ্য বস্তু খাওয়ার পাত্র অর্থাৎ একপ্রকার বাসন। চাউর শব্দের অর্থ চাউল। বর এবং কনের ভবিষ্যত দাম্পত্য জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করাকে কুড়মি সমাজে গণাপড়হা বলা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে ছিপাচাউর নেগের মাধ্যমে গনাপড়হা করা হয়। আর্য্য সংস্কৃতিতে একে যোটক বিচার বলা হয়। অপরাধ নেবেন না। কৃপনতা করার মানসিকতা নিয়ে কলম ধরিনি। কিন্তু পরিসর অতি স্বল্প তাই ক্রিয়া কর্ম্ম বিশ্লেষণে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্ষমাপ্রার্থী।

২) রেবার অথবা বরতুক অথবা দুআইর গুঁহদা অথবা হাঁতবাঁই ঃ-

কুড়মালি ভাষার অতি প্রাচীন শব্দ। তাই বর্ত্তমানে উক্ত শব্দগুলির নামে যে সংস্কার পালিত হয় সেই সংস্কারে পালনীয় নেগ-চারের বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান ব্যতীরেকে যেমন শব্দগুলির সঠিক অর্থ জানা সম্ভব নয়, তেমনি সংস্কারটির তত্ব বা মর্ম জানা ও সম্ভব নয়। শব্দগুলির অর্থের সাথে সংস্কারে পালিত নেগ-চার ওতোপ্রতভাবে জড়িত আছে। যেমন ঃ- রেবার ঃ- কুড়মালি সংস্কৃতিতে বরের বাবা বেটার অর্থাৎ ছেলের বিয়ে করে এবং কনের বাবা বেটিকে অর্থাৎ মেয়েকে বিয়ে দেয়। এই বিয়ে করা এবং বিয়ে দেওয়ার তাৎপর্য বরের বাবা কনেকে বেটার বউ পুতউহু অর্থাৎ পুত্রবধুরূপে গ্রহণ করতে স্বীকার করা এবং কনের বাবা কনেকে অর্থাৎ মেয়েকে বরের বাবার পুতউহুরূপে হস্তান্তর করতে স্বীকার করা। এতৎসূত্রে প্রমাণ পাওযা যায় কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিবাহ সংস্কারে বর-কনের ভূমিকা গৌন। বরের বাবার এবং কনের বাবার ভূমিকা মুখ্য। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিবাহের বয়স পহনা উমেইর অর্থাৎ কিশোর বয়স নির্ধারিণ করা হয়েছে। এই বয়সে ছেলেমেয়ের মগজের বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করেনি ঠিকই কিন্তু রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কার্য্যকারী। তাই প্রবাদবাক্য স্বরূপ বলা হয় "ধেরি বাঁধি বিহা, মন সউদা সাঁঘা' যেখানে গ্রহণ করা এবং হস্তান্তর করা সেখানে অবশ্যই শর্তাশর্ত আরোপ করা জড়িত থাকা স্বাভাবিক।

কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারের নেগ-চার নিখুঁতভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আধারে বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ পাওয়া যায় বরের বাবা বেটার অর্থাৎ বরের ঘাড়ে ঋণগ্রস্তা মেয়ে অর্থাৎ কনে চড়িয়ে দেওয়া পাপ, অপরাধ বিবেচিত হয়েছে। পরিবারের কর্ত্তা বাবা, অতএব বাবার বর্ত্তমানে মেয়ে অর্থাৎ কনে ঋণগ্রস্তা, এযুক্তি খাটে না। পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রেই অবশ্যই খাটে না। কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে অবশ্যই খাটে । তাই তো কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারে দেখা যায়, শিশু মাতৃ জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ শিশুর পরিচর্য্যাতে ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী বরের আজিমা অর্থাৎ বাবার মা সাজনী ডালাতে উক্ত দ্রব্য সামগ্রী সাজিয়ে রাখে এবং একখানা শাড়ীও সাজিয়ে রাখে। শাড়ীখানা ধাইশাড়ী অর্থাৎ ধাত্রীমার শাড়ী নামে পরিচিত। উক্ত ডালা কনে বাড়ীতে পাঠানো হয়। এই নিয়ম পালনের উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে জানা যায় কনে মাতৃ জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়াকালে তার পরিচর্যাতে ব্যবহৃত

দ্রব্যাদি ঋণে কনে তার বাবার নিকট ঋণগ্রস্থা তাই উক্ত দ্রব্যাদি কনের বাবাকে ফেরৎ দিয়ে কনেকে ঋণমুক্ত করা। তদ্রূপ ধাই মাকে ধাই শাড়ী দিয়ে ধাইমার পারিশ্রমিক ঋণ থেকে কনেকে ঋণমুক্ত করা হয় বরের বাবা কনেকে এইভাবে আঁতুড় ঘরের ঋণ থেকে ঋণ মুক্ত করার প্রথা কুড়মালি সংস্কৃতিতে স্বীকৃত এবং প্রচলিত আছে। এরপর মাতৃদুগ্ধ পান করে জীবিত থাকাকালে কনে সাধারণত যাদের দুগ্ধ পান করার সম্ভাবনা থাকে যেমন ঃ- আজিমা, দুধুমা, জেঠিমা, কাকীমা, পিসিমা, মামিমা, মাসীমা ইত্যাদি মাতৃ সম্পর্কীয়া সকলকে অর্থাৎ এক কথায় যারা কনের মহুয়ামউরা খাওয়ার অধিকারী তাদের সকলকে অতীতে ঠেঁঠি, পাঁচন বর্ত্তমানে শাড়ী দিয়ে কনেকে তাদের ঋণ থেকে ঋণমুক্ত করার প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। এরপর মুঁজুঠান অর্থাৎ অন্নপ্রাশন থেকে কনে নির্বাচিতা হওয়া সময়কাল পর্যন্ত সময়ে কনের প্রতিপালন, ভরনপোষণ বাবদ কনের বাবা কনের জন্য যে আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে সেই ব্যয়িত ঋণ থেকে ও বরের বাবা কনেকে ঋণমুক্ত করার প্রথা কুড়মালি সংস্কৃতিতে স্বীকৃত এবং প্রচলিত আছে। কিন্তু সেটা খাতা কলমে হিসেব কষে নয়। প্রতীকরূপে প্রচলিত আছে। অতীতে সেটা ছিল পাঁচ সিকা অর্থাৎ একটাকা পচিশ পয়সা। তারপর পাঁচটাকা বর্ত্তমানে পঁচিশ টাকা। এই প্রতীক মূল্যের হাত ধরেই কুড়মি সমাজে কনে পণ প্রথার প্রচলন ঘটে এবং বর্তমানেও প্রচলিত আছে।

কনে নির্বাচিতা হওয়ার পরবর্ত্তীকালে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে কনের জন্য ব্যয় বা খরচ হওয়ার মত যাবতীয় ব্যয়ভার বরের বাবা বহন করে। যেমন ঃ- রেবারের মত সগুন কর্মে, লগ্নবাঁধার মত সগুন কর্মে এবং বিবাহকালে কনের পরিধেয় কাপড় -চোপড়, সাজ-পোষাক, প্রসাধনী, অলঙ্কারাদি সমস্ত বরের বাবাকে দিতে হয়। এই দেওয়া নেওয়ার বিষয়টি বরের বাবা, কনের বাবা এবং সমবেত আত্মীয়-স্বজন, হিত-মিতান সকলের সহমতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তারপর বর পক্ষের এবং কনে পক্ষের শুভাশুভ, সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে লগ্নবাঁধার এবং বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয়। উক্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত বরের বাবা এবং কনের বাবা মেনে চলতে বাধ্য থাকে। বাধ্য থাকার অর্থ বরের বাবা কনের বাবার নিকট পরাজয় স্বীকার করা এবং কনের বাবা বরের বাবার নিকট পরাজয় স্বীকার করা। উভয়ে উভয়ের নিকট পরাজয় স্বীকার করা। তৎসূত্রে রেবার সংস্কারের পরিসমাপ্তিকালে বরের অতীতে মামা বর্তমানে কাকা এবং কনের অতীতে মামা বর্তমানে কাকা এবং কনের অতীতে মামা বর্তমানে সমধি সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান অবস্থাতে বরের কাকার স্বীকারোক্তি 'মঁই বেটা হারেহেঁই' এবং কনের কাকার স্বীকারোক্তি 'মঁই বেটি হারেহেঁই' এইভাবে পরস্পর পরস্পরের কাছে পরাজয় স্বীকার করাকে কুড়মালি ভাষাতে রবঅ করা বলা হয়। রবঅ শব্দ থেকে রেবার শব্দের উৎপত্তি। যে সগুনচারে অর্থাৎ শুভ সংস্কারে বরের বাবা এবং কনের বাবা রবঅ করাকরি হয় সেই সগুন চার রেবার নামে নামাঙ্কিত হয়েছে।

বরতুক ঃ- কুড়মালি ভাষার বর এবং তুক শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে বরতুক শব্দটি গঠিত। বর

শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ শ্রেষ্ঠ এবং তুক শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ হাসিল। তুক শব্দটির অর্থ পরিস্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। যেমন ঃ- কুড়মালি ভাষাতে " তাককে তুক লাগা অর্থাৎ তাকে তুকলাগা" বাক্যটি বহুল প্রচলিত বাক্য। এক্ষেত্রে তাকে মানে বতরে বা সুযোগে এবং তুক লাগা মানে হাসিল হওয়া। বিবাহ বিষয়ক ক্ষেত্রে বিবাহ সংক্রান্ত সকল কায্যাদি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্ম হাসিল করাকে বরতুক বলা হয়।

দুআইরগুঁহদা ঃ- কুড়মালি ভাষার দুআইর এবং গুঁহদা শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে দুআইরগুঁহদা শব্দটি গঠিত। কুড়মালি ভাষার দুআইর শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ দরজা ব্যাপকার্থে বাড়ী এবং গুঁহদা শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ মাড়ানো ব্যাপকার্থে পদার্পণ করা। সম্যক দুআইরগুহদা শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ দরজা মাড়ানো ব্যাপকার্থে বাড়ীতে পদার্পণ করা। বিবাহ বিষয়ক কর্মে কনে বাড়ীতে পদার্পন করা ব্যাপকার্থে বিবাহ সংক্রান্ত শুভকর্ম সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে কনে বাড়ীতে যাওয়াকে দুআইরগুঁহদা বলা হয়।

হাঁতবাঁই ঃ- হাঁত শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ হাত বা হস্ত। বাঁই শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ বাহু। বিবাহ বিষয়ক কর্মে কনের কাকা এবং বরের কাকা বাহু পর্যন্ত হাত প্রসারিত করে সমধি সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বেটাবেটি হারাহারির শপথ গ্রহণ করাকে হাঁতবাঁই বলা হয়।

লগ্ন (লগন বাঁধা) ঃ- কুড়মালি সংস্কৃতিতে অতীতে লগন বাঁধা হতো বর ঘরে। সেই বাঁধা লগন পৌঁছে দেওয়া হত কনে বাড়িতে। কনে নিজে স্বয়ং সেই লগন গ্রহণ করতো। বর্ত্তমানে লগন বাঁধার দ্রব্যাদি বর ঘর থেকে কনে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কনে ঘরে লগন বাঁধা হয় সেখান থেকে বর ঘরের লগনটি নিয়ে আনা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে লগন বাঁধে গ্রামমাহাত তার অনুপস্থিতে বাখেইর বুড়হাঁই অর্থাৎ পরিবারের বয়োজৈষ্ঠ্য। এক কথায় কুড়মি ব্যতীরেকে অপর কাহারো লগন বাঁধার অধিকার থাকে না। কুড়মালি সংস্কৃতিতে পাঁচদিনের লগন বাঁধতে বাধ্য। কিন্তু যদি তিন দিনের লগনে বিবাহ ধার্য্য হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পাঁচদিনের বাঁধা লগন চুমানোর পর দুটো লগন খুলে দিয়ে তিন দিনের অর্থাৎ তিনটে লগন সংরক্ষণ করা হয়। যদি চট লগন চট বিহা অথবা হাঁত লগনে বিহা অর্থাৎ একদিনেই লগন এবং বিবাহ ধার্য্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে পাঁচদিনের লগন বাঁধার পর চুমানোর পর চারটে লগন খুলে দিয়ে একদিনের অর্থাৎ একটা লগন সংরক্ষণ করা হয়। এতদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় পাঁচদিনের অধিক লগন বাঁধা কুড়মালি সংস্কৃতিতে স্বীকৃত নয়।

লগন বাঁধার ক্ষেত্রে এই বাধা-নিষেধ, বাধ্যবাধকতার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বংশবৃদ্ধির উৎস নারী-পুরুষের যৌন মিলন নারী-পুরুষের অবাধে যৌনমিলনের আধার বিবাহ। এক কথায় বলা হয় বিবাহ বংশবৃদ্ধির মুলাধার। তেজ, ব্রহ্ম এবং বাতাস ক্রিয়াশীল অবস্থাতে সমানুপাতিক হারে মিলন জীব সৃষ্টির উৎস এবং পুরুষ প্রকৃতি উক্ত

তিনের ক্রিয়াশীল অবস্থাতে মিলনের আধার। এক কথায় বলা যায় উক্ত পাঁচ ব্যতীরেকে জীব সৃষ্টি অসম্ভব। উক্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে বিবাহ। কিন্তু লগ্ন ব্যতীরেকে বিবাহ অসম্ভব। অর্থাৎ লগ্ন বিবাহের মূলাধার। যেহেতু বংশবৃদ্ধির মূলাধার বিবাহ তাই বিবাহ শুভ অর্থাৎ শুভ বিবাহ। শুভ বিবাহের মূলাধার বিবাহ তাই বিবাহ শুভ অর্থাৎ শুভ বিবাহ। শুভ বিবাহের মূলাধার লগ্ন তাই শুভ লগ্ন। তৎসূত্রে কুড়মালি সংস্কৃতিতে পাঁচটা লগন অর্থাৎ লগ্ন বাঁধাতে বাধ্য করা হয়েছে। লগ্ন বাঁধার অর্থ শুভ বিবাহের শুভ কর্মের সূচনা করা। কুড়মালি সংস্কৃতিতে লগ্ন বাঁধা থেকে শুরু করে বিবাহের শুভ কর্মের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বর কনেকে বহুবিধ শুভাশুভ, বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

অধিবাস (এইদবাস) ঃ- লগ্ন অর্থাৎ লগন বাধার পর লগ্নের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য বিবাহের পূর্বের, বিবাহ কালের এবং বিবাহের পরে অবশ্য পালনীয় শুভ সংস্কার সম্পন্ন করাকে এইদবাস অর্থাৎ অধিবাস পালন বলা হয়। তৎসূত্রে এই দিনটিকে এইদবাস অর্থাৎ অধিবাস দিন বলা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে বর কিম্বা কনের মধ্যে কাহারো যদি ধরম পুজা না হয়ে থাকে তাহলে অধিবাসের দিন ভোরে প্রথমে ধরম পূজা সংস্কার সম্পন্ন করা অনিবার্য্য। ধরম পূজা করার নিয়মানুসারে যদি ধরম পূজা করাতে বাধা থাকে সেক্ষেত্রে বিবাহ পরবর্ত্তীকালে ধরম পূজা করার মানত করে ঘরে 'মুধইন খুঁটাতে' সুপ অর্থাৎ কুলো ঝুলিয়ে দিতে হয় কুড়মালি সংস্কৃতিতে ধরম পুজা সংস্কারের সংস্কৃত না হয়ে বিবাহ সংস্কার অবৈধ।

খারছাড়ি ঃ- অধিবাস দিনের সকাল বেলা বরের বাড়ীতে বরের এবং কনের বাড়ীতে কনের খারছাড়ি সংস্কার সম্পন্ন করা প্রথা কুড়মালি সংস্কৃতিতে প্রচলিত আছে। খার এবং ছাড়ি কুড়মালি শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে খারছাড়ি শব্দটি গঠিত। কুড়মালি ভাষার খার শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ ছাই বা ভস্ম এবং মূল শব্দ ছাড়া থেকে সৃষ্ট ছাড়ি শব্দের প্রতিশব্দ দূর করা এক্ষেত্রে ময়লা দূর করা। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় ফুটন্ত জলের সাথে ছাই মিশিয়ে তাতে ময়লা কাপড় ডুবিয়ে আবার ফুটিয়ে পরিস্কার জলে কাপড় কেচে কাপড়রের ময়লা দূর করা অর্থাৎ পরিস্কার করার প্রচলন প্রচলিত আছে। তৎসূত্রে যে সংস্কারের দ্বারা বর এবং কনের ময়লা দূর করা হয় সেই সংস্কারকে খারছাড়ি সংস্কার নামে নামকরণ করা হয়েছে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিবাহের যে বয়সধার্য্য করা হয়েছে সেই বয়সে বর এবং কনের মানবিক, সাংসারিক এবং সামাজিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। তাই তাদের জ্ঞানহীনতারূপ ময়লা দূর করার প্রয়োজন আবশ্যিক। কারণ বিবাহ সংস্কার তাদেরকে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। কুড়মি সমাজে ধোপানী খারছাড়ি সংস্কারে সংস্কৃত করার পন্থা প্রচলিত আছে। অনুরূপভাবে কুড়মি সমাজের বিবাহ সংস্কারের নাপিত এবং ধাত্রীরও কর্তব্য পালনের ভাগ বিভাজন করা আছে। এক কথায় কুড়মি সমাজের বিবাহ নাপিত, ধোপানী এবং ধাত্রী ব্যতীরেকে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। বরং প্রমাণ পাওয়া যায়, কুড়মি সাজের বিবাহ সংস্কারের কোনও নেগে-চার অর্থাৎ নিয়ম সংস্কারে ব্রাহ্মণ কিংবা বৈষ্ণবের প্রয়োজন আবশ্যিক নয়। এক কথায় বলা যায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবের প্রয়োজন পড়ে না।

মাঁড়ুআ বাঁধা এবং পূজা ঃ- মড়ই শব্দের অর্থ তুলসি বা তুলসি গাছ মড়ই থান অর্থাৎ স্থানকে কুড়মালি ভাষাতে তুলসি টিপ এবং বাংলা ভাষাতে তুলসি মঞ্চ বলা হয়। প্রতিদিন ভোরবেলা মড়ই থানে অর্থাৎ তুলসি ঢিপিতে গোবর মিশ্রিত জলে সূর্য্যদেবের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে সূর্য্যদেবকে আহ্বান করাকে মড়লি দেওয়া বলা হয়। এতদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় মড়ই শব্দ থেকে মড়লি শব্দের উৎপত্তি। তৎসূত্রানুসারে মড়ই থানে যে পূজা করা হয় সেই পূজার নাম মাড়ুআ পূজা। এতএব মড়ই শব্দ থেকে মাড়আ শব্দের উৎপত্তি। বংশবৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী এবং শিশুর রক্ষাকর্ত্রী দেবী ষষ্ঠীমাতার অবস্থান মড়ই থান। অতএব মড়ই স্থান ষষ্ঠীমাতার পীঠস্থান। ষষ্ঠীমাতার পীঠস্থান অর্থাৎ মড়ই থানে যে পূজা করা হয় সেই পূজা অবশ্যই ষষ্ঠী পূজা কিন্তু মাড়ুআ পূজা নামে পরিচিত।

তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় মড়ই থানের পূজা মানে মড়ই পূজা। এর জবাবে বলা যায় যদি পুজাটা মড়ইএর উদ্দেশ্যে হতো তাহলে পুজাটার নাম মাড়ুআ পূজা না হয়ে সরাসরি মড়ই পুজা হতো। দ্বিতীয়তঃ মড়ই পূজা করার জন্য আলাদাভাবে মাড়ুআ বাঁধার প্রয়োজন পড়তো না। অতএব মড়ই থানে মাড়ুআ বেঁধে যে পুজা করা সেই পুজা অবশ্যই বংশবৃদ্ধি অর্থাৎ শিশু রক্ষাকর্ত্রী মাষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে মাড়ুআ পুজা। যাঁরা আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতির জিতিআ পুজাকে মাষষ্ঠীর পুজা অভিহিত করেন, তাঁরা কুড়মালি সংস্কৃতি বিষয়ে সঠিক গবেষণাতে ব্যর্থ। কারণ সংস্কৃতির যে তিনটা বিভাজন রয়েছে সেগুলিকে কখনোই একের মধ্যে অন্যকে প্রবিষ্ট করানো উচিত নয়। তাতে কুড়মালি সংস্কৃতির বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্মরণ রাখতে হবে কুড়মালি সংস্কৃতি পুরোপুরি বিজ্ঞান আধারে গঠিত। কুড়মালি সংস্কৃতির বিজ্ঞান অনুসন্ধানের পথ সাংস্কৃতিক নেগ-চারে অবশ্য করণীয় ক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করা। এর জন্য অবশ্যই কুড়মালি ভাষাতে জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে। যাঁরা একের মধ্যে অন্যকে প্রবিষ্ট করে কুড়মালি সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেন তাঁরা শুধু কুড়মালি সংস্কৃতির বিজ্ঞানকেই ধ্বংস করেন না বরং কুড়মি সমাজকে ও বিভ্রান্ত করেন। মাড়ুআ বাঁধা এবং পূজা করার একমাত্র অধিকারী আজা অর্থাৎ দাদু মানে বাবার বাবা।

মাড়ুআ বাঁধার পদ্ধতি ঃ অঙ্গনে ছামড়া বাঁধার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আজা আমপাতার বনমালা ছামড়ার চারপাশে টাঙিয়েছেন। তারপর মড়ই থানের সম্মুখ ভাগে পূর্বমুখে প্রথমে চারকোনাতে চারটি গর্ত খনন করেন এবং ঐ গর্তগুলোতে একেকটি শালডাল পুতেন। উক্ত শাল ডালগুলির মধ্যবর্তী স্থানে অপর একটি গর্ত খনন করেন। সেই গর্তটিকে প্রথমে শালপাতার বঁহতাতে গোটা হলুদ গাঁঠা আতপচাল তাঁবা বা তাম্র দূর্বাঘাস হরিতকি ফল পুতেন তারপর গর্তটিতে বর ঘরে আমগাছের ডাল কনে ঘরে মহুয়া গাছের ডালের সাথে একটি করে শাল ডাল এবং সিধা ডাল একত্র করে পুতেন। উক্ত তিনটি ডালকে সঠিকভাবে একসাথে গুছিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে খড় নির্মিত মোটা দড়ি কুড়মালি ভাষাতে বড় বলা হয়, সেই বড় দিয়ে আড়াই পাক ঘুরিয়ে বেঁধে ফেলেন। সেই বাঁধনকে শক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তার উপর সাবই ঘাসের দড়ি বাঁধেন। তার উপর আজি মাঁই কাঁচা মাটির প্রলেপ লেপন করেন। সেই প্রলেপের উপরে

আজাবাপ হাতের চেটোকে আতপ চালের চুনিতে তিনটি চেটোর দাগ দেন। তিনটি চেটোর দাগের মাঝখানে সিঁদুরের টিকা দেন।

আড়াই পাক ঘুরিয়ে মাড়ুআ বাঁধার তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তন্ত্রধর্মাবলম্বী তান্ত্রিক কুড়মি জাতি জানতো জীবদেহ কুলকুন্ডলিনি আড়াই পাক ঘুরপাক খেয়ে মেরুদন্ডের একেবারে শেষপ্রন্তে নিম্ন মুখে শায়িত আছেন। শ্বাসাঘাতে কুলকুন্ডলিনীকে জাগ্রিত করা যায়। কুলকুন্ডলিনী জাগ্রিত হলে প্রারব্ধ কর্মে সাফল্য লাভে সাধকের মন একাগ্রচিত্তে সন্নিবেশিত থাকে। বিবাহ পর্ব পরিসমাপ্তির পর বর এবং কনের নতুন সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী। স্বামী স্ত্রীর প্রারব্ধ কর্ম সন্তান সন্ততির জন্ম দিয়ে বংশধারা প্রবাহ অব্যাহত রাখা। সন্তান সন্ততির জন্ম দেওয়ার একমাত্র পথ স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে প্রেম প্রীতি ভালবাসা দিয়ে যৌনমিলনে মিলিত হওয়া। মাড়ুআ পুজার মাধ্যমে আজাবাপ নিজ নাতি নাতনির সন্তান লাভের জন্য গর্ভাবস্থা থেকে শিশুকাল পর্যন্ত শিশুরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্টীর নিকট প্রার্থনা জানান।

পুঁড়খুখড়ি পূজা ঃ- কুড়মালি ভাষার পুঁড় এবং খুখড়ি শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে পুঁড়খুখড়ি শব্দটি গঠিত হয়েছে। পেঁড়কা অথবা পাঁড়রা শব্দ থেকে পুঁড় শব্দটির উৎপত্তি। পেঁড়কা অথবা পাঁড়রা শব্দ দুটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ ধবধবে সাদা। খুখড়ি শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ মুরগী। যে পুজাতে ধবধবে সাদা মুরগী উৎসর্গ করে বলিদান দেওয়া হয় সেই পুজাকে পুঁড়খুখড়ি পূজা বলা হয়। কুড়মি সমাজে ধরম ঠাকুরের অর্থাৎ সূর্যদেবের পূজাতে ধবধবে সাদা মুরগী অথবা পাঁঠা উৎসর্গ করে বলিদান দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। কুড়মি জাতি যে ধর্ম পালন করে সেই ধর্মের নাম সারনা ধর্ম। সারনা শব্দটির অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য কেন্দ্রীক সারনা ধর্মে কুড়মি জাতি ধরম ঠাকুরের পুজার সাথে সাথে সমগ্র দেবমন্ডলের পূজা করার প্রথা প্রচলিত আছে। পুঁড়খুখড়ি পূজাতে একই সীমারেখার মধ্যে নয়টি খঁড় কেটে অর্থাৎ কুঠরী কেটে নয়টি দেবদেবীকে নির্ধারিত নিজ নিজ খঁড়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরম্পরাগত প্রচলিত রঙের অর্থাৎ দেবদেবীর প্রসন্নতা অনুযায়ী রঙের অতীতে নয়টি মুরগী উৎসর্গ করে বলি দেওয়া হতো। বর্তমানে টুনকি রোগের প্রাদুর্ভাবে কুড়মি বাড়ি থেকে মুরগী উৎখাত হওয়ার জন্য মুরগীর পরিবর্তে ঘিয়ের পিঠা অভাবে মিষ্ঠান্ন উৎসর্গ করে পুজা করা হয়। পুঁড়খুখড়ি পূজা করার অধিকার কুড়মালি ভাষাতে এউহাত গুগুঁবাপ অর্থাৎ গুগুঁ বাংলা ভাষাতে স্ত্রী জীবিত আছে এমন জেঠামশায়।

কুড়মালি সংস্কৃতির পুড়খুখড়ি সংস্কারটির পরিবর্তে ব্রাহ্মন্যবাদী সংস্কারে নান্দীমুখ সংস্কার নামে প্রচলিত। ব্রাহ্মন্যবাদী সংস্কারের উক্ত নান্দীমুখ সংস্কারকে কুড়মি সমাজে ঘিউঢারি বলে। পুঁড়খুখড়ি এবং ঘিউঢারির মধ্যে কোনটাতে কি বিজ্ঞান বা যুক্তি রয়েছে সেই বিজ্ঞান বা যুক্তি বিষয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। জীব সৃষ্টির উৎস পঞ্চভূত সৃষ্টির উপাদান। কুড়মালি সংস্কৃতি পুঁড়খুখড়ি পুজাতে নবম দেবমন্ডলে উক্ত উপাদান বিশিষ্ট দেবদেবী বর্তমান। সকলেই জানি বিবাহ সংস্কার পালনের অর্থ নিজ বংশবৃদ্ধি ধারা প্রবাহ অব্যাহত রাখা। সন্তান সন্ততির জন্ম দেওয়া। সন্তান সন্ততির জন্ম দেওয়ার একমাত্র পথ স্বামী স্ত্রীর যৌন মিলনে মিলিত

হওয়া। যৌন মিলনে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে স্বামী অর্থাৎ পুরুষের অংশ মাটি জল এবং তাপে অধাংশে মোট আড়াই এবং স্ত্রীর অর্থাৎ প্রকৃতির বায়ু ব্যোম এবং তাপকে অবশিষ্ট অর্ধাংশ মোট আড়াই। এই দুই আড়াইতে সর্বমোট পাঁচভূতে জীবের সৃষ্টি। কুড়মালি সংস্কৃতির পুঁড়খুখুড়ি সংস্কারে পুরোপুরি সৃষ্টিত্ত্বের আরাধনা উপাসনা করা হয়। অপরদিকে নান্দীমুখ সংস্কারে কোন দেবদেবীর আরাধনা উপাসনা করার পরিবর্তে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতি পুঁড়খুখড়ি সংস্কারে সারনা ধর্মের প্রাকৃত নবম দেবদেবী মন্ডলে সৃষ্টি তত্ত্বের সমস্ত উপাদানের অধিষ্ঠাতা দেবী বর্তমান।

লক্ষ্যনীয় বিষয় সারনা ধর্মে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিবাহ সংস্কারের ছিপাচাউর সংস্কার থেকে শুরু করে পুঁড়খুখড়ি পূজা সংস্কার পর্যন্ত কোনও সগুন চারে অর্থা শুভ সংস্কারে পাঁজি-পুথি, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এমনকি জামাই-এর পর্যন্ত প্রয়োজন পড়ে না। কাকা, জেঠা, দাদু উক্ত শুভ সংস্কারগুলি সম্পন্ন করার প্রমান পাওয়া যায়।

পখেইর কড়া / ঘাট বাঁধা / ঘাট পুজা ঃ- বর ঘরে বরের কুড়মালি ভাষাতে ভাটু অথবা বহনই বাংলা ভাষাতে জামাইদা অথবা ভগ্নিপতি বরের স্নানের জন্য প্রতীকি পখেইর অর্থাৎ পুকুর খনন করে। অনুরূপ ভাবে কনে ঘরে কনের ভাটু অথবা বহনই কনের স্নানের জন্য প্রতীকি পুকুর খনন করে। এক কথায় বর এবং কনের জামাইদা অথবা ভগ্নিপতি অর্থাৎ ঘরের জামাই পখেইর কড়া কাজটি করার অধিকারী। এই প্রতীকি পখেইর কড়া নেগ অর্থাৎ নিয়ম থেকে বাকি সমস্ত নেগ চার অর্থাৎ নিয়ম-সংস্কারে জামাই এর প্রয়োজন অতি অবশ্যই পড়ে। এক কথায় জামাই ব্যতীরেকে সম্পন্ন হয় না। তাই কুড়মালি প্রবাদ বাক্যে বলা হয় "ঝন, জাঁউআই, ভেইগনা, তিন নঁহঁত আপনা।" ঝন অর্থাৎ মজুর সে তার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক অবশ্যই নেবে। অনুরূপভাবে কুড়মি সমাজে বিবাহের পুরোহিত অর্থাৎ নাঁইআঁ জামাই এবং ঘাট কামান কিরিআক অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর্মের পুরোহিত অর্থাৎ নাঁইআ ভেইগনা অর্থাৎ ভাগ্নে। তদানুসারে বলা হয় " বিহাক নাঁইআঁ জাঁউআই' অর্থাৎ বিবাহের পুরোহিত জামাই। লক্ষনীয় বিষয় পখেইর কড়া অর্থাৎ পুকুর খনন করা নেগ-চারের পূর্বের নেগ-চারগুলিতে জামাইএর ও প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ নাঁইআ অথবা পুরোহিত বিহীনভাবে কাকা, জ্যেঠা, দাদু সম্পন্ন করে। কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারের ছিপাচাউর অর্থাৎ যৌটক বিচার থেকে শুরু করে লগন বাঁধা পর্যন্ত সংস্কারগুলিতে নাঁইআঁ অর্থাৎ পুরোহিতের প্রয়োজন পড়ে না। পখেইর কড়া অর্থাৎ পুকুর খনন করা থেকে শুরু করে বাকী সমস্ত সংস্কার জামাই-এর নাঁই আঁলিতে সম্পন্ন হয়।

জামাইএর খনন করা পুকুরের ঘাট বাঁধে এবং ঘাট পুজা করে পুতউহু অর্থাৎ বৌমা, বর কনের ভউজাই অর্থাৎ বৌদি। ইত্যবসরে অপরদিকে বর-কনের শুদ্ধতা এবং সৌন্দর্য্যবর্ধন হেতু নাঁউ আঁঠাকুরে অর্থাৎ নাপিতে বর-কনের 'নখ টুগিকন গড়ে আলতা পিঁধাউন নেগ সরাউএই অর্থাৎ নখ কেটে পায়ে আলতা পরানোর নিয়ম সম্পন্ন করে। নখ কেটে দেওয়ার সময় নাপিত বর এবং কনের বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুলের নখ এমনভাবে কাটে যাতে সামান্য

রক্তপাত ঘটে। সেই রক্তে পরিস্কার নেকড়াছোট টুকরা ভিজানো হয়। রক্তে ভিজা নেকড়ার টুকরাকে সিনেই বলা হয়। সিনেইটি জামাইএর হেফাজতে সংরক্ষিত থাকে। এরপর জামাইএর খনন করা পুকুরে বৌদির বাঁধানো ঘাটে বৌদির সরবরাহ করা জলে বৌদি বরকে হলুদ তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেয়। স্নান সমাপনান্তে বর থুভড়া ভাত অর্থাৎ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বরের সাজ-পোষাক পরে আমমউরা খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তৈরী থাকে।

আম মউরা খাওয়ানো (আম মউরা খাউআউঅন)ঃ- আম মউরা খাওয়ানো সংস্কারটির নাম সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব রয়েছে। যেমনঃ- অনেকে বলে আম মউরা খাওয়ানো অথবা আম মউরা খাওয়া। আবার অনেকে বলে আম বিহা। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের পথ প্রথমত ঃ কুড়মালি ভাষার ব্যাকরণগত বিচারে আমের লিঙ্গ নির্ণয় করা। কারণ সমলিঙ্গে বিবাহ হয় না। ব্যাপকরণগত বিচারে প্রমাণ পাওয়া যায় আম পুংলিঙ্গ। যেমনঃ- আমটা গিরে হেইক অর্থাৎ আমটা পড়ছে। আমটা খাহঁ অর্থাৎ আমটা খাচ্ছি জামটি গিরেইস অর্থাৎ জামটি পড়ছে। জামটি খাহাক অর্থাৎ জামটি খাও। কুড়মালি ভাষাতে বস্তু বাচক শব্দের শেষেটা যুক্ত শব্দের বস্তু পুংলিঙ্গ বাচক বস্তু হয়। এবং টি যুক্ত শব্দের বস্তু স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বস্তু হয়। অপরদিকে তর্কাতীতভাবে বর পুংলিঙ্গ। অতএব পুলিঙ্গের সাথে পুংলিঙ্গের বিহা অর্থাৎ বিবাহ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ আম মউরা খাওয়া সংস্কারের তাৎপর্য অনুসন্ধানের সূত্র উক্ত সংস্কার সম্পন্ন করার সময় পরম্পরাগতভাবে শ্রুতিরূপে যে গীতটি গাহা হয় সেই গীতটি মর্মার্থ এবং ভাবার্থ অনুসন্ধান করা। গীতটি হলো -

তঁইএঁ জে জাবে বেটা, ধনি আননে গঅ।
দেইএ রাখেঁ দুধেকেরি ধার।।
দুধেকেরি ধার, মাঁই গঅসুধালেনিসুধাই গআ।
পিনডি পাড়ি করবঁ উপার।।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে আম মউরা খাওয়ানোর পরবরের ঘরে ঢোকা নিষেধ। তাই বরের মা আম মউরা খাওয়ার সময় বর সাজে সজ্জিত নিজ পুত্রকে মাতৃদুগ্ধ পান করা মাতৃঋণ পরিশোধ করে বিবাহ করতে অর্থাৎ স্ত্রী আনয়ন করে আদেশ করেন।

বরের মা কল্পনা করেছিলেন যেহেতু বর শিশুকালে মাতৃদুগ্ধ পান করে, মায়ের সেবা-যত্নে লালিত-পালিত হয়ে কিশোর বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছে তাই তার হৃদয়ে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ভরপুর আছে। তদুপরি বর কনেকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে কনের সারাজীবনের সুখ-দুঃখ, ভরনপোষনের দায়ভার গ্রহণ করতে চলেছে। এমতাবস্থাতে বর যদি আন্তরিকভাবে কনেকে ভালবাসতে না পারে, সর্বান্তকরণে আপন করে নিতে না পারে তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবন দুঃখ দায়ক বিষয় হবে, যা মায়ের কাম্য নয়। এই সব চিন্তাতে মমতাভরা মায়ের হৃদয় কল্পনা করেছিল, বরের মায়ের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রদ্ধা-ভক্তি বদ্ধমূল হয়ে আছে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তিকে পরোক্ষমুখী করা হয় তাহলে পরের হৃদয়ে কনেকে ভালবাসার আপন করে নেওয়ার বীজ অঙ্কুরিত হবে, পল্লবিত হবে। দাম্পত্য জীবন সুখকর, মধুময় হবে।

এর আধার বরের অন্তরে মাতৃদুগ্ধ ঋণমুক্তির বিশ্বাস গড়ে তোলা। আম মউরা খাওয়া অর্থাৎ আম পাতার বোঁটাকে বর মুখে চিবিয়ে রস বের করে সেই রস মাকে খাওয়ানো সংস্কারের মাধ্যমে উক্ত বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার কল্পনা করেছিল। এর তাৎপর্য্য কনের জন্ম লগ্ন অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া কাল থেকে তার সিঁথিতে বরে সিঁদুর প্রদান করা কাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করার কর্ম বরের বাবা সম্পন্ন করেন। কারণ তিনি তাঁর সাংসারিক জ্ঞান অজ্ঞ কিশোর বয়সের পুত্রের ঘাড়ে তার স্ত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার দায়ীত্বের সাথে স্ত্রীকে সারাজীবন সহধর্মীনীরূপে গ্রহণ করার দায়িত্বে দায়ীত্ববান করেন, কনে সারাজীবন বরের ঘরে অবস্থান করে বরের ভার বা বোঝা হয়। কনের বাবা কন্যাকে বরের হাতে সমর্পণ করে কন্যার ভার বহন করা থেকে মুক্তি পান। তাই কুড়মি সমাজে মেয়েকে বিয়ে দেওয়াকে বলে 'বেটিকে ডাইর ধরাউলেঁই।' কিন্তু বর কনের সাথে কনের বাপের ঘরে অবস্থান করে না কনের ঘাড়ে চড়ে কনের ভার বা বোঝা হয় না। তথাপি বরকেও ঋণমুক্তহয়ে সমশ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কারণ কনেকে যেন ভবিষ্যত জীবনে বরের ঋণের খেসারত দিতে না হয়। তাই বর সাজে সজ্জিত পুত্রকে মা বলছেন মাতৃদুগ্ধ পান করা ঋণ আগে পরিশোধ করে বিবাহ করতে অর্থাৎ ধনি অর্থে স্ত্রী আনয়ন করতে উপদেশ দেন। বর সাজে সজ্জিত পুত্র মাথা পেতে মায়ের উপদেশ গ্রহণ করে ধর্মের আধারে যুক্তি দিয়ে মাকে বোঝাচ্ছে মাতৃদুগ্ধ ঋণ অপরিশোধ্য ঋণ। এই ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব। তথাপি পুত্র হয়ে আমি আমার কর্তব্যে অটল থেকে তোমার মরনের পর তোমার বিদেহী আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার পথ নিষ্কন্টক করার উদ্দেশ্যে পিনডঅ দান করবো। অপরন্তু ভেষজ বিজ্ঞান জ্ঞানে জ্ঞানী কুড়মি জাতি প্রমাণ পেয়েছিল আম মউরা অর্থাৎ আম পাতার বোঁটার রস মাতৃদুগ্ধ গুণের প্রায় প্রায় সমগুন সম্পন্ন রস। তাই মাতৃদুগ্ধ ঋণ পরিশোধ করার প্রতীকরূপে বর মাতৃস্থানীয়া সকলকে আম মউরা খাইয়ে মাতৃদুগ্ধ ঋণ পরিশোধ করা সংস্কার পালন করে। আমপাতার বোঁটার রসকে মাতৃদুগ্ধ সমতুল্য কল্পনা করার কারণ মায়ের খাদ্যবস্তুর গুনাগুনের জন্য, খাওয়ার সময়ের হেরফের ঘটার জন্য মায়ের শরীরে অম্ল,পিত্ত, রসের পরিমানের হেরফের ঘটে। সেই হেরফের ঘটা রক্তে সৃজিত মাতৃদুগ্ধ শিশু পান করে। ফলে শিশু বোমী করে। আয়ুর্বেদীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্রষ্টা কুড়মি জাতি প্রমাণ পেয়েছিল আমপাতার বোঁটার রস পান করানোতে শিশু পুত্রের বোমী বন্ধ হয় এবং পান করা দুগ্ধ শিশুপুত্রের শররে পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধন করে, পুরুষ সুলভ দেহ গঠনে সাহায্য করে। এতৎ সূত্রে আম পাতার বোঁটার রস মাতৃদুগ্ধ সমতুল্য।

কুড়মালি প্রবাদ্য বাক্যে বলা হয় 'জিঁঅতে জুঁঠা, মরনে কাঁধে।' অর্থাৎ মা বাবার জীবদ্দশাতে ছেলে-মেয়ের এঁঠো খাওয়া ধর্মের এবং মরনের পরে ছেলের কাঁধে চড়ে শ্মশানে যাওয়া ধর্মের হয়।

তদুপরি আম মউরা খাওয়া সংস্কারে বরকে আমগাছের সাথে ফুল অর্থাৎ মিতালী পাতানো অর্থাৎ মিত্রতা সম্পর্ক গড়ে তোলা সংস্কার পালন করতে হয়। যেমন ঃ- বরকে আম

গাছের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়া সংস্কার পালন করতে হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে, কুড়মি সমাজে সমশ্রেণীভুক্ত ব্যতীরেকে অপর কাহারো সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়া অবৈধ। তৎসূত্রে সমধিতে সমধিতে অর্থাৎ ছেলের শ্বশুর এবং মেয়ের শশুরের সাথে ছেলে বা মেয়ের বাবা পরস্পর পরস্পরের সমধি। এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ যোগ্য অর্থাৎ বৈধ। তদ্রুপ ফুল অর্থাৎ মিত্র মিত্রের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়া বৈধ।

অতীতে কুড়মি সমাজে ফুল পাতানো অর্থাৎ মিত্রতা গড়েতোলা একটি সামাজিক সংস্কার ছিল। বর্তমানে এই রেওয়াজ নাই তা বলা যাবে না। তবু বহুলাংশে অবলুপ্তির মুখে। প্রমাণ পাওয়া যায় স্বজাতির সাথে স্বজাতির ফুল পাতানো অবৈধ ছিল। একের দৈহিক গঠন অথবা স্বভাব-চরিত্র এবং আচরণ অন্যের সাথে সাদৃশ্যগত মিল পর্যবেক্ষন করে তাদের দুজনের ফুল পাতিয়ে দেওয়া হয়। সাদৃশ্যগত মিল অর্থে সমতা অর্থাৎ সমশ্রেণীভুক্তির প্রমাণ। আম গাছের সাথে বরের ফুল পাতানো অর্থে আমগাছ এবং বর এক অন্যের সমান। প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রথমত আম পুংলিঙ্গ। বর ও পুংলিঙ্গ। দ্বিতীয়ত উদ্ভিদ বিজ্ঞান জ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানী এবং স্রষ্টা কুড়মি জাতি আম ফলের পরিপক্কতা লাভের প্রক্রিয়ার সাথে পুরুষ মানুষের যৌবন প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার সাদৃশ্যগত মিল লক্ষ্য করেছিল। যেমন- আম ফলের আঁঠি প্রথমে আঁশবিহীন থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সেটা ক্রমান্বয়ে আঁশে আচ্ছাদিত হয়। আঁশ পরিপুষ্ট হওয়ার পর সেই আঁশ আম ফলে সৃষ্ট এবং সঞ্চিত থাকা রসের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে এবং চাপ সৃষ্টি করে ফলকে পাকিয়ে তোলে। পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রেও অন্ডকোষের বৃদ্ধির প্রক্রিয়াতে একই ক্রিয়া ঘটে। অন্ডকোষ বৃদ্ধির সাথে সাথে শুক্রবাহী অর্থাৎ বীর্য্যবাহী নালি দৃঢ়তা লাভ করে। শরীরে সৃষ্ট এবং সঞ্চিত থাকা বীর্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং যৌবন প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তৃতীয়ত পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে স্ত্রীর জঠের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার ভার গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ যোগ্য হতে হয়। এক কথায় স্ত্রীর জঠর ক্ষুধা নিবৃত্তি করা পুরুষের ধর্ম। আম ফল ও জঠর ক্ষুধা নিবৃত্তি করার ভর গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ যোগ্য হতে হয়। এক কথায় স্ত্রীর জঠর ক্ষুধা নিবৃত্তি করা পুরুষের ধর্ম্ম। আম ফল ও জঠর ক্ষুধা নিবৃত্তি করা গুনে গুণ সম্পন্ন। বিশেষ করে শরীরে শক্তি যোগানো এবং বীর্য্য বাড়ানো ক্ষেত্রে আম ফল অতুলনীয় গুণসম্পন্ন। আম ফলের পুরুষোচিত উক্তগুণাবলী পর্যবেক্ষণ করে আমকে পুরুষ মানুষের সমশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ সমান কল্পনা করেছিল। আম গাছের সাথে বরের ফুল পাতানো সংস্কার বিবাহ সংস্কারের সাথে সংযুক্ত করে বিবাহ সংস্কারকে প্রাকৃত এবং সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

কুড়মি সমাজে সমধি সমধির সাথে, ফুল ফুলের সাথে অর্থাৎ মিত্র মিত্রের সাথে এবং বর আম গাছের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ হৃদয়ে হৃদয়ের মিল ঘটায়। তৎসূত্রে একের পারিবারিক, অর্থনৈতিক এমনকি সমভ্রমতা সঙ্কটাপন্ন হলে অপরে সঙ্কটমোচনার্থে সহয়োগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আম কিভাবে বরের সঙ্কট মোচনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বরকে সাহায্য করে? উপকারীর উপকার স্বীকার করা মানসিকতা

সম্পন্ন কুড়মি জাতি তার বৈজ্ঞানিক মননশীলতাতে স্বীকার করা মানসিকতা সম্পন্ন কুড়মি জাতি তার বৈজ্ঞানিক মননশীলতাকে আমের উপকার উপলব্ধি করেছিল। যেমন ঃ- প্রথম আম পাতার বোঁটার রস মাতৃদুগ্ধ ঋণের মতো অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধ করাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত দাম্পত্য জীবনে আহারদির সঙ্কট দেখা দিলে আম দিয়ে তৈরী বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য যেমন আমসত্ব, আমসি, আচার এবং ঋতুতে কাঁচা বা পাকা আম খেয়ে সাময়িক তৃপ্তি লাভ করা যায়। কুড়মালিতে একেই বলে 'তিন সাঁঝে এক সাঁঝ খেদা'। তৃতীয় ধাতু দৌর্বল্য কারনে যৌন মিলন ক্ষমতার অবনতি ঘটলে আম বীর্য্য বর্দ্ধনে সহয়তা করে। অতএব আম কেবলমাত্র উপকারীই নয় সাহায্যকারীও বটে। স্মরণ রাখবেন কুড়মি সমাজে বিধবা অথবা বিবাহ বিচ্ছেদা নারী স্বামীবিহীন থাকে না কারণ সাঁঘা প্রথার মাধ্যমে পুনঃরায় স্বামী লাভের ধর্মীয় সংস্কার প্রচলিত আছে।

আম মউরা খাওয়া সংস্কার পর্বের পূর্বে কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাতপাকে বাঁধা সংস্কার সম্পন্ন করা হয়। যেমনঃ- বর পাক খাওয়ানোবিহীন সুতার এক প্রান্ত আম গাছের সাথে সংযুক্ত রাখার জন্য বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে চেপে ধরে এবং বরের জামাইদা অথবা ভগ্নিপতি উক্ত সুতা বরের বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলিতে পাক খাইয়ে বাম কান পর্যন্তটান দেয় এবং একইভাবে এই টান দেওয়া কাজটি সাত বার করার পর সুতাটা ছিঁড়ে ফেলে। উক্ত ছিঁড়ে ফেলা সুতাটাকে তিন ভাঁজে ভাঁজ করে তাতে বোঁটা বিহীন আম পাতার মধ্যে আতপ চাউল, হলুদ চুর্ণ এবং দুর্বা ঘাস দিয়ে বেঁধে কাঁকনা তৈরী করে এবং বরের ডান হাতে কাঁকনা বাঁধে। সাত পাকে বাঁধা সংস্কারটি কুড়মালি সংস্কৃতিতে কাকনা বাধা নামে পরিচিত। কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারে যেমন ঃ- ১) সাতপাকে বাঁধা ২) ফুল পাতানো অর্থাৎ মিত্রতা বজায় রাখা এবং ৩) আম মউরা খাওয়া। উক্ত সংযুক্ত থাকা কারণে কুড়মি জাতি আম গাছ ছেদন করে না অর্থাৎ কাটে না বরং সংরক্ষণ করে। বনভূমি সৃজনে প্রসার ঘটায়। আম মউরা খাওয়ার পর বরের মাতা ববের বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুলিতে হাল্কা কামড় দিয়ে প্রশ্ন করলেন কোথায় যাচ্ছো? জবাবে বরের উক্তি কামি আনতে চলেছি। বর্ত্তমানে কামি শব্দের পরিবর্ত্তে কামিনী বা কামিন শব্দ ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে। কামিনী অথবা কামিন শব্দের অর্থ চাকরানী। স্ত্রী এবং পুত্রবধূ কখনও চাকরানী হতে পারে না। অতএব শব্দটি কখনই কামিনী হতে পারে না। অপরদিকে কামি শব্দের অর্থ সৃজনশীলা। তন্ত্র শাস্ত্রে ক কার অক্ষরটি ব্রহ্মযোনি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। যা (আ) কার অক্ষরটি বায়ু অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। ম কার অক্ষরটি ব্রহ্ম অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। ি(হ্রসই) কার অক্ষরটি গতি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। অতএবকা শব্দে ব্রহ্মযোনিতে বায়ু অর্থাৎ ব্রহ্মধারণে উপযুক্ত। মি শদটি ব্রহ্মে গতি অর্থাৎ সৃজনশীল ব্রহ্ম। সামগ্রিক কামি শব্দের অর্থ যে সৃজনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন তাকে আনতে চলেছি।

আম মউরা খাওয়া সংস্কার সমাপনান্তে বরযাত্র সমভিব্যাহারে বর কনে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কনে বাড়ীতে পৌছানোর পর কনের কাকা (গুআটিকা) অর্থাৎ সুপারী

ফোঁটা সংস্কারের মাধ্যমে বরকে অভ্যর্থনা জানায়।

গুআটিকা অর্থাৎ সুপারীফোঁটা ঃ- গুআ এবং টিকা শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে গুআটিকা শব্দটি গঠিত। কুড়মালি ভাষার গুআশব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ সুপারী এবং টীকা শব্দের প্রতিশব্দ ফোঁটা। গোটাসুপারীকে দই মাখিয়ে সেই দই মাখানো সুপারীকনের কাকা বরের কপালে পর পর তিনবার ফোঁটা দিয়ে বরকে অভ্যর্থনা জানায়।

ডুভাভাঁজন ঃ- ডুভা এবং ভাঁজন শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে ডুভাভাঁজন শব্দটি গঠিত। কুড়মালি ভাষার ডুভা শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ খাদ্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্য বস্তু খাওয়ার পাত্র এবং ভাঁজন শব্দের প্রতিশব্দ অনুমান করা। ডুভা ভাঁজন সংস্কারের সারমর্ম উভয় পরিবারের খাদ্যবস্তু অনুমান করে উভয় পরিবারের মধ্যে বন্টন করে খাওয়ার অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়া।

পিঁধান - অড়হান ঃ কনে সাজে সুসজ্জিত হওয়ার নববস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি বরের বাবা সমাগত সকলের উপস্থিতিতে কনেকে প্রদান করা সংস্কারকে কুড়মালি ভাষাতে পিঁধান অড়হান সংস্কার বলা হয়।

মউহাঁ মউরা খাউআ (মহুলপাতার বোঁটার রস খাওয়া) মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া কাল থেকে কনে নির্বাচিতা হওয়া কাল পর্য়ন্ত কনের পরিচর্যা এবং ভরণপোষণের জন্য কনের বাবা যে ব্যয় বহন করে থাকে বরের বাবা সেই সমস্ত ব্যয় কনের বাবাকে ফেরৎ দিয়ে, পরিশোধ করে কনেকে ঋনমুক্ত করার প্রথা কুড়মালি সংস্কৃতিতে, কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু কনে নিজে তার মায়ের দুগ্ধ পান করার জন্য মাতৃদুগ্ধ ঋণে ঋণগ্রস্থা থাকে। তাই সেই ঋণ তাকে নিজেকে পরিশোধ করে ঋণমুক্ত হওয়ার প্রথা কুড়মালি সংস্কৃতিতে প্রচলিত আছে। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ ঋণ অপরিশোধ্য ঋণ। তথাপি মাতৃদুগ্ধ ঋণ পরিশোধের প্রতীক মহুহাঁ মউরা মা এবং মাতৃস্থানীয়াদের খাওয়ানো প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। মহুহাঁ মউরা খাওয়ানো সংস্কারের মধ্যেই সাতপাকে বাঁধা এবং মহুঁহা গাছের সাথে কনের ফুল পাতানো অর্থাৎ মিত্রতা স্থাপন করা সংস্কারগুলি সংযুক্ত আছে।

সাতপাকে বাঁধা ঃ- কনে পাক খাওয়ানোবিহীন সুতার এক প্রান্ত মহুহাঁগাছের সাথে সংযুক্ত রাখার জন্য বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলিতে চেপে ধরে এবং কনের জামাইদা অথবা ভগ্নিপতি উক্ত সুতা কনের বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলিতে পাক খাইয়ে বাম কান পর্যন্ত টান দেয় এবং একই রকম এই টান দেওয়া কাজটি সাতবার করার পর সুতা ছিঁড়ে ফেলে। উক্ত ছিঁড়ে ফেলা সুতাকে সমান তিন ভাঁজে ভাঁজ করে এবং বোঁটবিহীন মহুহাঁ পাতার মধ্যে আতপচাল, হলুদ চুর্ন এবং দুর্বাঘাস রেখে পাতাটাকে ভাঁজ করে উক্ত সুতাটাকে বেঁধে কাঁকনা তৈরী করে। এবং কনের বাম হাতে কাঁকনা বাঁধে। সাতপাকে বাঁধা সংস্কারটি কুড়মালি সংস্কৃতিতে কাঁকনাবাঁধা সংস্কার নামে পরিচিত।

মহুহাঁ গাছের সাথে কনের ফুল পাতানো অর্থাৎ মিত্রতা স্থাপন করা ঃ- সাদৃশ্য অথবা সমতা বিচার করে ফুল পাতানো অর্থাৎ মিত্রতা স্থাপন করা প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে।

মহুহাঁ গাছের সাথে কনের সাদৃশ্য অথবা সমতা বিচারে প্রমাণ পাওয়া যায়, মহুঁহা গাছে ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার আধার স্বরূপ প্রথমে খঁচ ধরে অর্থাৎ ফুলকে ধরে রাখার আধার তৈরী হয়। সেই আধার অথবা খঁচের গঠন এবং গুণগত মানের সাথে স্ত্রী জাতির জরায়ুর (কইখকর) গঠন এবং গুণের সাদৃশ্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত মহুহাঁ ফুলের রস জীবকে মাতিয়ে রাখা গুনে গুণসম্পন্ন ।স্ত্রী জাতি ও স্বীয় স্বামীকে প্রেম, ভালবাসা দিয়ে মাতিয়ে রাখা গুণে গুণ সম্পন্না। তৃতীয়তঃ কনে স্ত্রী লিঙ্গ। ব্যায়করনগত বিচারে মহুহাঁ তর্কাতীতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ। একটি ধাঁধার মাধ্যমে ও প্রমাণ পাওয়া যায় মহুহাঁ স্ত্রীলিঙ্গ। ধাঁধাটি হলো "মাঁইবেটিক একে নাম, ঢুবকা ছঁড়াক ভিনু নাম।' মাঁই-বেটি অর্থে মহুহাঁ গাছ এবং মহুহাঁ ফুল। এক্ষেত্রে গাছের ও নাম মহুহাঁ এবং ফুলের নাম ও মহুহাঁয় ঢুবকা ছঁড়া মহুহাঁ ফল। মহুহাঁ ফলের নাম কিন্তু মহুঁহা নয়। মহুহাঁ ফলকে কচড়া বলা হয়। চতুর্থতঃ কুড়মি সমাজে স্বামী গতর খাটিয়ে ধন উপার্জন করে এবং স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। স্ত্রী সেই ধন ভবিষ্যতের জন্য সযত্নে সংরক্ষণ করে এবং অনিবার্য্য প্রয়োজনে ব্যবহার করে। মহুহাঁ ফুল ও বহুদিন রাখা যায় এবং অভাব-অনটনের সময় মহুহাঁ সিজা অর্থাৎ মহুহাঁ সিদ্ধ করে আবার মহুহাঁলাঠা অর্থাৎ চাল ভাজার সাথে মিশিয়ে ঢেঁকিতে ভেঙে খাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ও কনের সঞ্চয় করে দক্ষতার সাথে মহুহাঁ ফুলের দীর্ঘদিন খাদ্য উপযোগী থাকার গুণের সাদৃশ্য দেখা যায়। কনের এবং মহুহাঁর গুণগত মানের সাদৃশ্য বিচার করে কুড়মি জাতি মহুহাঁ গাছের সাথে কনের ফুল পাতানোর অর্থাৎ মিত্রতা স্থাপন করা সংস্কার পালন করে।

মহুহাঁ মউরা খাওয়া ঃ- কনে শিশুকালে মাতৃদুগ্ধ পান করে জীবনধারণ করেছিল। মায়ের সেবা-যত্নে লালিতা-পালিতা হয়ে কিশোরী বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছে স্বাভাবিকভাবে কনের অন্তরে মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করার জ্ঞানের উদয় হয়েছে। বিবাহ সংস্কারে মাধ্যমে কনে তার বরের বংশবৃদ্ধি করার জন্য স্বামী লাভ করার পথে পা বাড়িয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সূচনা ঘটাতে চলেছে। নূতন সংস্কার গড়ার স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আধার বর কনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সুদৃঢ়ভাবে প্রেম, ভালোবাসা, মমত্ববোধে বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা যত বেশী গভীর হয়, দাম্পত্য জীবন ততবেশী সুখকর হয়, মধুময় হয়। কিন্তু কনে শিশুকালে মাতৃদুগ্ধ পানে এবং মায়ের সেবা-যত্নে লালিতা-পালিতা হওয়ার কারণে কনে নিজ মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবনতা থাকা স্বাভাবিক। মায়ের মমতাভরা হৃদয় উক্ত চিন্তাতে চিন্তান্বিতা হয়ে কল্পনা করেছিল কনের অন্তরে মায়ের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে যে গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি বদ্ধমূল আছে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি কনের দাম্পত্য জীবনে শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এই চিন্তাতে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিকে পরোক্ষমুখী করার কল্পনা করেছিল। এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কনের মা অতীতে কৃতকর্মের পথ অবলম্বন করেছিল। অতীতে কুড়মি জাতি শিশু কন্যার ভুক্ত খাদ্য বস্তু থেকে উৎপন্ন এবং দেহ গঠনের সহায়ক রস রূপে মহুহাঁ পাতার বোঁটার রস খাওয়ানো হতো। এক কথায় মহুহাঁ পাতার বোঁটার রসকে শিশু কন্যার ক্ষেত্রে অন্নরস বলা হয় এতএব কনের অন্তরে মাতদুগ্ধ

ঋণমুক্তির বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য মহুহাঁমউরা খাওয়া অর্থাৎ মহুহাঁ পাতার বোঁটাকে কনে মুখে চিবিয়ে রস বের করে এবং সেই রস মাকে খাওয়ানো সংস্কারের মাধ্যমে মাতৃদুগ্ধ ঋণমুক্তির বিশ্বাস গড়ে তোলার কল্পনা করেছিল। একেই বলা হয় মহুহাঁ মউরা খাওয়া।

হাঁড়ি বিহা আর সালাধতি ঃ- বংশবৃদ্ধির ধারাকে বিধিসম্মতভাবে অব্যাহত রাখার জন্য মনুষ্য সমাজ বিবাহ সংস্কার পালন করে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর তথা ধর্মাবলম্বীর মানুষ বিভিন্ন নিয়ম-নীতিতে বিবাহ সংস্কার গড়ে তুলেছে। শৈব, তান্ত্রিক, প্রকৃতিপুজক কুড়মি জাতি বিশ্বচরাচরের জীবজগতের সৃষ্টিতত্ব তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিল মহাশূন্যে অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরে সর্ব্বপ্রথম শব্দব্রমেহর সৃষ্টি হয়। সেই শব্দ ব্রহ্ম থেকে বিন্দু অর্থাৎ পরমব্রহ্মের সৃষ্টি হয়। বিন্দু থেকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়। বিশ্বচরাচরের কোলে জীবজগতের সৃষ্টি হয়। যেহেতু বিবাহ সংস্কার বংশবৃদ্ধির অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ক সংস্কার তাই কুড়মি জাতি সৃষ্টির আদি বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির উৎস মহাশূন্যের অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের আকৃতির প্রতীক হাঁড়ি অর্থাৎ কলসি এবং জীবজগতের সৃষ্টির উৎস বিশ্বচরাচরের অর্থাৎ প্রকৃতি মাতার কোল অর্থাৎ স্ত্রী জাতির জরায়ুর আকৃতির প্রতীক হাঁড়ি। উক্ত সূত্রে হাঁড়িকে অর্থাৎ কলসিকে প্রকৃতি মাতার প্রতীক কল্পনা করেছিল। কিন্তু প্রকৃতি এককভাবে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টির উৎস পুরুষ-প্রকৃতির যৌন মিলনের মাধ্যমে রজঃ এবং বীর্যের ক্রীয়াশীল অবস্থাতে ব্রহ্মযোনীতে মিলন।

পুরুষ-প্রকৃতির অর্থাৎ নারী-পুরুষের বিধিসম্মতভাবে এবং অবাধে যৌনমিলনের উৎস বিবাহ সংস্কারের সংস্কৃতবান হওয়া । বিবাহ হয় বর এবং কনের। কনেকে বিবাহ করে বর। কুড়মালি সংস্কৃতিতে কনে বিবাহ করে না, বিবাহ নেয়। পুরুষ স্ত্রীর জরায়ুতে সৃষ্টির জন্য বীর্য্যরূপ বীজ বপন করে কিন্তু সৃষ্টিকে ধারণ করার আধার স্ত্রীর জরায়ু। হাঁড়ি জরায়ুর প্রতীক। বর হাঁড়ির গায়ে সিঁদুরের রেখা টানার অর্থ বর কনের মাথাতে সিঁদুর প্রদান করে তার জরায়ুতে বীর্য্য দানের মাধ্যমে সৃষ্টি করার অধিকারে অধিকারী হওয়া। বর যেহেতু হাঁড়ির গায়ে সিঁদুরের রেখা টানে তাই তাকে হাঁড়ি বিহা বলা হয়।

হাঁড়ি বিহা সম্পন্ন করার অব্যাহতি পরেই সালাধতি লুটা নেগ অর্থাৎ নিয়ম পালন করা হয়।

সালাধতি লুটা ঃ- সালা শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ শ্যালক । ধতি শব্দের প্রতিশব্দ ধুতি এবং লুটা শব্দের প্রতিশব্দ ছিনিয়ে নেওয়া । বর টোপর খুলে মাথাতে নতুন ধূতির পাগড়ী বাঁধে। অনুরূপভাবে কনের দাদা অথবা ভাই অর্থাৎ বরের হবু শ্যালক মাথাতে নতুন ধুতির পাগড়ী বাঁধে। উভয়ে উভয়ের সাক্ষাতে পাগড়ী খুলে ফেলে এবং খোলা পাগড়ী বিনিময় করে। বিনিময় করাকে ছিনিয়ে নেওয়ার রূপ দেওয়া হয়েছে। বস্ত্র মানুষের লজ্জা নিবারণ করে, ইজ্জৎরক্ষা করে। সালাধতি লুটার ভাবার্থ বর এবং হবু শ্যালক উভয়ে উভয়ের ব্যক্তিগত অথবা পরিবারিক ইজ্জৎ এবং সমভ্রমতা রক্ষার ক্ষেত্রে আগবাড়িয়ে এসে সহায়তা করার

অঙ্গীকার বদ্ধ হয় ।

সিঁদরাদান ঃ-

সিঁদরাদানের সময় বরের বাবার দেওয়া শাড়ী এবং অলঙ্কার দিয়ে কনে সুসজ্জিতা হয়। কনের জামাইদা এবং ভগ্নিপতিগণ অতীতে দউরার (বর্ত্তমানে ডালা বাঁশের তৈরী বৃহৎপাত্র) মধ্যে অতীতে নড়হা বর্তমান শিলার (বাঁটনাবাঁটার শিলা) উল্টোপিঠে বসিয়ে বহন করে কনেকে ছাঁদনা তলাতে হাজির করে। কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারের নিয়ম-নীতি বিস্ময়কর। যেমন ঃ- পাত্রী অনুসন্ধানকালে পাত্রী দর্শনপ্রার্থীগণের সামনে পায়ে হেঁটে হাজির হয়। রেবার সংস্কারের সময় ও পাত্রী পায়ে হেঁটে মঞ্চে হাজির হয়। লগ্ন গ্রহণ করার সময়ও পাত্রী পায়ে হেঁটে এসে লগ্ন গ্রহণ করে কিন্তু সিঁদরাদানের মাধ্যমে পাত্র পাত্রীকে বধূরূপে গ্রহণ করতে যাওয়ার সময় পাত্রী পায়ে হেঁটে পাত্রর সামনে হাজির হয় না। পাত্রীর জামাইদা এবং ভগ্নীপতিগণ দউরার মধ্যে নড়হাতে বসিয়ে বহন করে এনে হাজির করে নির্দিষ্টভাবে দউরা এবং নড়হা ব্যবহারের বিজ্ঞানসম্মত কারণ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। তন্ত্র ধর্মবিলম্বী কুড়মি জাতি তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়েছিল পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে জীবের সৃষ্টি। তাই তারা পুরুষের প্রতীক পুরুষাঙ্গ অর্থাৎ বান এবং প্রকৃতির প্রতীক ভগযোনি অর্থাৎ ভগ। এই ভগ এবং বান এর মিলিত রূপকে সৃষ্টির উৎস কল্পনা করেছিল। বিবাহ সংস্কারে ভগ অর্থ পাত্রী এবং বান অর্থে পাত্র। পাত্রী পাত্রের সাথে মিলন হেতু আগ বাড়িয়ে পাত্র সমীপে নিজেকে হাজির করার অর্থ যৌন মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করা যা স্ত্রীজাতির পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সৃষ্টি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার গুরুদায়িত্ব স্ত্রী জাতির অতএব পাত্রীকে অনিবার্যভাবে পাত্রের সাথে মিলিত হতেই হবে। তাই সঙ্কেতের মাধ্যমে মনের ইচ্ছা প্রকাশের প্রতীক দউরার মধ্যে নড়হা। দউরা জরায়ু অর্থাৎ ভগের প্রতীক এবং নড়হা পুরুষাঙ্গ অর্থাৎ বানের প্রতীক। অতএব দউরার মধ্যে নড়হা অর্থে ভগ যুক্ত বান। পাত্রী ভগ যুক্ত বান প্রতীকি সঙ্কেতের মাধ্যমে পাত্রকে প্রলুব্ধ করে এবং জানিয়ে দেয় সে তার সাথে মিলন হেতু তার সামনে উপস্থিত। পাত্র এগিয়ে এসে পাত্রীর বসে থাকা দউরার গায়ে সিঁদুরের তিনটি রেখা টানে। তারপর উভয়ে উভয়ের সিনেই অদলবদল করে। সিনেই বদলের পর প্রথম পাত্রী পাত্রের গলাতে আকন্দ ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। পাত্র ও পাত্রীকে আকন্দ ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। এভাবে উভয়ে উভয়কে তিনবার মালা পরিয়ে দেওয়া দেওয়ি হয়। কুড়মালি সংস্কৃতির উক্ত সংস্কারগুলিকে সিনেই বদল, মালা বদল বলা হয়। এরপর সিঁদরাদান। পাত্রী প্রথমে পাত্রের কণ্ঠে পরপর তিনবার সিঁদুরের ফোঁটা দেয় তারপর পাত্র পাত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পেলন করে সিঁদুরে মাথা রাঁগিয়ে দেয়। সিনেই বদল থেকে শুরু করে সিঁদরাদান পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করার সময় আত্মীয়-স্বজন, হিত মিতানের হরিবল ধ্বনিতে ছাঁদনা তলা মুখরিত হয়ে উঠে। পাত্র পাত্রীকে হাতে ধরে দউরা থেকে বের করে মাড়ুআকে আড়াই পাক প্রদক্ষিণ করার পর পাত্র তার বাম পাশে পাত্রীকে এনে উভয়েই আসনে উপবিষ্ট হয়।

পরছন ঃ- পাত্রীর মাতা এবং মাতৃস্থানীয়া মহিলাগণ বর কনেকে পরছে কুড়মালিতে পরছথিন। পর এবং ছাঁহিরাউঅন শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে পরছন শব্দটি গঠিত। পরছন শব্দের ক্রিয়া পদে পরছা শব্দের সাথে প্রত্যয় যোগে পরছথিন অর্থাৎ পরছে। পর শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ অপর এবং ছাঁহিরাউঅন শব্দের প্রতিশব্দ অনিষ্ঠ করা বা অশুভশক্তি আরোপ করা। পরছা সংস্কারের দ্বারা কনের মাতা বর-কনেকে অপরের আরোপিত অশুভশক্তি অথবা অনিষ্ট করার ক্রিয়া থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেন্দু কাষ্ঠদন্ডের আঘাতে চুর্ণবিচুর্ন করে প্রতিরোধ করে।

ক্ষীরখাওয়া ঃ- পরছার পর বর-কনেকে আদর করে, সোহাগ ভরে ঘরে ঢুকিয়ে ভোজন করানো হয়। এই ভোজন করানোকে ক্ষীর খাওয়া বলা হয়।

ঘারভরা ঃ- কুড়মি সমাজে ছেলের চেয়ে মেয়ের স্থান উপরে এবং অনেকবেশী আদরের। মেয়ে ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপা। সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মেয়ে আপন জন্মভিটার মায়ামমতা পরিত্যাগ করে আপনকে পর এবং পরকে আপন করার লক্ষ্যে শশুরালয়ে যাবে। অতএব মেয়েকে বিদায় দিতে হয়। ভগবানের কাছে মেয়ের হিত প্রার্থনা করে, অন্তরের শুভাশীর্ব্বাদ জানিয়ে সানন্দে মেয়ে বিদায় দেওয়া হয়। কিন্তু পিত্রালয়ের লক্ষ্মীস্বরূপা মেয়ে পিত্রালয় পরিত্যাগ করে যাওয়ার সাথে সাথে পিত্রালয়ের লক্ষী অর্থাৎ অর্থনীতি যেন ভেঙ্গে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কুড়মি সমাজ ঘারভরা সংস্কার পালন করে।

চুমান ঃ- চুমান শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। চউ এবং মান শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে চউমান শব্দটি গঠিত। চউ শব্দটির উ কার অক্ষরটি প্রতীক চিহ্ন। রুসুকার উকারের প্রতীক চিহ্ন। রুসুকার চউ শব্দের চ অক্ষরটির সাথে যুক্ত হয়ে চু শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে এবং উ-কার অক্ষরটি স্বাভাবিকভাবে অবলুপ্ত হয়েছে। চউ শব্দের অর্থ চার (৪)। অতএব চু শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবে চার। মান শব্দের অর্থ সম্মান। চুমান শব্দের অর্থ চারদিকের সন্মান। বিবাহ সংস্কার আত্মীয়-স্বজন, হিত-মিতান, ফুল-পরান, বন্ধু-বান্ধব চারদিকের ইঙ্গিতবাহী এবং অলঙ্কারাদি, কাপড়-চোপড়, টাকাকড়ি, বিভিন্ন দ্রব্যাদি সম্মানের ইঙ্গিতবাহী। এক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির দান সামগ্রীকে চুমান বলা হয়। চুমান শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ উপঢৌকন।

বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর না পরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত কনে বরের কুড়মালি ভাষাতে বহু অথবা মাগ এবং বাংলা ভাষাতে স্ত্রী অথবা বধূ হয় না। কনে বরের বহু অর্থাৎ বধু হয়ে শশুরালয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়। শশুরালয়ের রান্নাঘর বিষয়ে তার জ্ঞান থাকার কথা নয়। তাই রান্নাঘরে অহরহ ব্যবহার্য সমস্ত প্রকারের দ্রব্য সামগ্রী যেমন থালা, বাটি, ঘটি, গ্লাস, গাগরা, হাঁড়ি, চাটু, খুন্ত, বঠিন, শিলা-নড়হা ইত্যাদি পিত্রালয় থেকে চুমান অর্থাৎ উপঢৌকন দেওয়া হয়। অনুকরণ প্রেমী কুড়মি বর্ত্তমানে বরপণ দেওয়ার সাথে সাথে উপঢৌকন দেওয়ার বহর প্রতিযোগীতা মুলকভাবে বাড়িয়ে দিয়ে নিজের আভিজাত্য প্রচারের মিথ্যা চেষ্টাতে জোঁক বাড়িয়েছে। যেমনঃ- ফুর্তি ওড়ানোর জন্য, জীবন বিপদাপন্ন করার জন্য যাতায়াতে সুবিধার

অজুহাতে দুইচাকা এমন কি চার চাকার মোটরগাড়ী, বসন, শয়ন, কথোপকন, বিলাসীতার আসবাবপত্র চুমান অর্থাৎ উপঢৌকন দেওয়া চালু করেছে। বরপণ এবং চুমানের বহর বাড়ানো কুড়মি সমাজের আত্মঘাতী প্রথা। শীঘ্রাতিশীঘ্র এদুটোর বিলোপ ঘটিয়ে সমাজকে রক্ষা করা উচিত। নচেৎ কুড়মি ভূমিহীন হয়ে ভিক্ষার ঝুলি ধরতে বাধ্য হবে।

বরের মায়ের পরছন ঃ- সিঁদরাদানের পর কনের মা মেয়ে-জামাইকে ওখানকার অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পরছে। তদ্রুপ বরের মা স্বস্থানের অনিষ্টকারী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বেটা-পুতউহুকে অর্থাৎ ছেলে-বউমাকে পরছা প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। বরের মায়ের পরছন পদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন ঃ- বরের মা বৌমাকে লোহার খাড়ু পরানো। ডবকা নাচ নাচা। চুমান অর্থাৎ উপঢৌকন পাওয়া দ্রব্যসামগ্রীকে অগ্নি স্পর্শ করানো ইত্যাদি। উক্ত সংস্কারগুলির বিজ্ঞানসম্মত কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নচেৎ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যাবে। তান্ত্রিক কড়মি জাতি জ্যোতির শাস্ত্র জ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানবান ছিল। জ্যোতিযশাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় শনি-রাহুর অন্তর্দশা গর্ভ সঞ্চারের প্রতিকুল। শনি-রাহুর অন্তর্দশার প্রতিকার লোহা ধারণ অনিবার্য্য। বরের মা অতিসত্তর নাতি-নাতনির মুখ দর্শনে ব্যগ্র। তাই সন্দেহ ভঞ্জন হেতু শাশুড়ী বৌমাকে লোহার খাড়ু অর্থাৎ লোহা ধারণ করানো প্রথা কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারের সংযুক্ত হয়েছে এবং কুড়মি সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

ডবকা নাচ নাচা ঃ- ডবকা শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। ডবকা শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ উল্লম্ফন। যে নাচে নাচুনেকে উল্লম্ফন দিয়ে নাচতে হয় সেই নাচকে ডবকা নাচ বলে। শিব উল্লম্ফন দিয়ে তান্ডব নৃত্ত নেচেছিলেন। শিবের তান্ডব নৃত্যতন্ত্র সাধনার মুদ্রা বিশেষ। উল্লম্ফন নৃত্যতন্ত্র সাধনার মুদ্রা সাধন। তন্ত্র সাধনার বিভিন্ন মুদ্রার বিভিন্ন উপকারীতা আছে। ডবকা নাচে স্ত্রীজাতির জরায়ু পরিস্কার হয়। জরায়ু পরিস্কার থাকা গর্ভসঞ্চারের সহায়ক। শাশুড়ী নিজে ডবকা নাচ নেচে বৌমাকে ডবকা নাচের প্রশিক্ষণ দেন এবং ঠারে-ঠুরে অর্থাৎ আকারে-ঈঙ্গিতে জরায়ু পরিস্কার রাখার উপদেশ দেন।

উপঢৌকন পাওয়া দ্রব্যাদিতে অগ্নি স্পর্শ করানো ঃ- কুড়মি জাতি তান্ত্রিক। তন্ত্র সাধনাতে সঠিক পথে এগোনোতে মোক্ষ ভাল করা যায়। একে বিদ্যা বলা হয়। পথভ্রষ্ট হয়ে বিপতে এগোনোতে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করা যায়। একে অবিদ্যা বলা হয়। অবিদ্যাতে নিজের কোনও লাভ হয় না। অপরের অনিষ্ট করার ক্ষমতা লাভ করা যায়। সমাজে বহুবিধ জ্ঞানে জ্ঞানবান মানুযের বসবাস। অবিদ্যা প্রাপ্ত ব্যক্তির উপঢৌকনে অনিষ্টকারী ক্ষমতা আরোপিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই সন্দেহ নিরসন হেতু অগ্নি স্পর্শ করিয়ে আরোপিত অনিষ্টকারী শক্তির বিনাস ঘটানো হয়। কুড়মি সমাজ সমেত সমস্ত আদিবাসী সমাজের ডাইনী-বক্অস (ডাইনীবিদ্যা জ্ঞানেজ্ঞানী পুরুয মানুয) ভূত-প্রেত, পাঁচবহনী- সাতবহনী, চুড়িন জগীন ইত্যাদি বিশ্বাস অবৈজ্ঞানী এবং অপসংস্কৃতি নয়। এর মধ্যে বিজ্ঞান আছে। ডাইনী-বক্অসদেরকে নির্যাতন করা, প্রাণদন্ড দেওয়া অবশ্যই অবৈজ্ঞানিক, অনস্বীকার্য্য এবং ক্ষমাহীন অপরাধের।

অবিদ্যা জ্ঞানকে হত্যা করো, অবিদ্যা জ্ঞানীকে নয়।

মৃত্যু সংস্কার (মরন চার)

মরন ঃ- মরণ শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ 'ম'কার 'র' কার এবং 'ন'কার অক্ষরগুলির সংযুক্তিতে মরন শব্দটি গঠিত। কুড়মালি ভাষার প্রায় সকল অক্ষর এককভাবে এক একটি শব্দের ভাষাভিত্তিক শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করে। মরন শব্দে ব্যবহৃত 'ম' কার 'র' কার এবং 'ন'কার অক্ষরগুলি কিন্তু এক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক শাব্দিক অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি। তন্ত্র সাধনা মার্গে জীব দেহের বিভিন্ন গুণের অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষররূপে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ- 'ম' কার অক্ষরটি বহ্মগুণ অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। 'র' কার অক্ষরটি তেজগুণ অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। 'ন' কার অক্ষরটি নৈতিবাচক অর্থাৎ না সূচক অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। অতএব মরণ শব্দের অর্থ জীব দেহে ব্রহ্মগুণ এবং তেজগুণ নাই। কুড়মালি ভাষার মরণ শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ মৃত্যু। মরণ অর্থাৎ মৃত্যু শব্দে সাধারণ ভাবে বোঝা যায় মৃত্যের দেহে ব্রহ্ম এবং তেজ এর সাথে সাথে বায়ু নাই। তাই প্রবাদ বাক্যে বলা হয় "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। এক্ষেত্রে শ্বাস শব্দের অর্থ বায়ু। তন্ত্র সাধন মার্গে মৃত্যুর পরিভাষাতে বলা হয়েছে প্রাণের তরঙ্গ প্রাকৃতিক কারণে কমতে কমতে এক লক্ষ থেকে মাত্র দশ শতাংশ তরঙ্গায়িত হলে জীবের মৃত্যু হয়। অতএব মৃত্যের দেহতে দশ শতাংশ বায়ু তরঙ্গ বিরাজমান থাকে। সম্পূর্ণ বায়ু তরঙ্গবিহীন হয় না। এই অবস্থাতে উক্ত দশ শতাংশ বায়ু তরঙ্গের সঙ্গে তার ফেলে আসা জীবনের সমস্ত কর্ম্মসংস্কার বীজাকারে থেকে যায়। এই কর্ম্মসংস্কার জীবকে পুনঃবায় জন্মের দিকে আকর্ষণ করে। এবং দশ শতাংশ প্রাণের তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এক লক্ষ্যে উপনীত হয়। তখনই জীবের পুনঃরায় জন্ম হয়। যে কর্ম্মসংস্কার জীবকে পুনঃরায় জন্মের দিকে আকর্ষণ করে সেই কর্ম্ম-সংস্কার মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কুড়মালি জাতি তন্ত্রধর্ম্মাবলম্বী তাই তারা তন্ত্র সাধনার দ্বারা কুলকুন্ডলিনীকে ষঠচক্র ভেদ করে সহস্রার পর্যন্ত উন্নীত করাতে সক্ষম ছিল এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটাতো। জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটানোর অর্থ মোক্ষ লাভ করা। কুড়মি জাতি জীবন নির্ব্বাহের পথতন্ত্র সাধনা এবং জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র পেশা কৃষিকর্ম। যেহেতু কুড়মি জাতি তান্ত্রিক এবং মোক্ষ লাভ করার অধিকারী তাই তাদের জীবন নির্ব্বাহ করার কর্ম্মসংস্কার তন্ত্র সাধনা আধারিত। জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র পেশা কৃষিকর্ম্ম, যার দ্বারা উৎপাদিত শস্য সমস্ত শস্যাহারী জীবকুলের উদর পুরন করে অর্থাৎ জীবে সেবা করে অর্থাৎ ঈশ্বর সেবা। মৃত পিতা মাতার জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটানোর পথ জীবদ্দশাতে তন্ত্রসাধনা করা এবং মরনের পর ঔরসজাত সন্তানের হস্তে পিন্ড পাওয়া। পিন্ড দানের মাধ্যমে ঔরসজাত সন্তান পিতামাতার প্রথম এবং প্রধান সংস্কার খাদ্য খাওয়া বা গ্রহন করা। খাদ্যগ্রহন করা ব্যতীরেকে জীব জীবন্ত থাকতে পারে না। তাই জীবকুল খাদ্য গ্রহন করা সংস্কারে অহরহ সংযুক্ত। তাই মৃত পিতা মাতা খাদ্যগ্রহন করা সংস্কারে যিক্ত থাকে এবং খাদ্যগ্রহন করা লালসাতে লালায়িত থাকে। ঔরসজাত সন্তান

পিন্ডদানের মাধ্যমে মৃত পিতা মাতার উক্ত লালসা নিরসন করে এবং মোক্ষ লাভ প্রপ্তির পথ পরিস্কার করে। কারণ সংস্কার জড়িত থাকা অবস্থাতে জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে পারে না। আমার মনে হয় পিন্ডদানের মাধ্যমে মৃত পিতামাতার খাদ্য গ্রহন করা সংস্কার মুক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ সংস্কারে পিন্ডদান প্রথা সংযুক্ত হয়েছে এবং প্রচলিত আছে।

তাই তাদের জীবিকা নির্বাহি করার কর্মসংস্কার ঈশ্বর সেবা আধারিত। কুড়মি জাতির জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা দুটো পথই মোক্ষ লাভ প্রাপ্তির পথ। সেই আধারে কুড়মি জাতি জন্মান্তর অথবা পুনর্জন্ম কোনটাই বিশ্বাস করে না। তাই তো কুড়মালি দর্শনে বলা হয়েছে -

তেঁহুঁ ডেঁইড়কা, মঁহুঁ ডেঁইড়কা।
একে ডভাক মাছ।।
তকউ খাতউ, মঁকউ খাতাক ডাঁইড় ধরিকে নাচ।

শব্দগুলির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ তঁহুঁ মানে তুমিও। ডেঁইড়কা মানে দাঁড়কিনী (মাছ বিশেষ) । মঁহুঁ মানে আমিও। একে মানে একই। ডভাক মানে বর্ষাকালে সৃষ্ট অতিক্ষুদ্র ক্ষুণস্থায়ী জলাশয়। মাছ মানে মৎস। তকউ মানে তোমাকেও। খাতউমানে খাবে অর্থাৎ ভক্ষণ করবে। মকউ মানে আমাকেও। খাতাক মানে খাবে। ডাঁইড়মানে সারিবদ্ধ। ধরিকে মানে ধরাধরি হয়ে। নাচমানে নৃত্য কর। উক্তিটির সারাংশ ছিলাম এবং থাকবো দুটোই অবিশ্বাস্য। আছি এটাই পরম সত্য। এতএব বর্ত্তমানকে উপভোগ কর।

তাই সারনা ধর্মে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে মৃত্যের দেহতে বিরাজমান দশ শতাংশ বায়ু তরঙ্গ এবং ফেলে আসা জীবনের কর্ম্মসংস্কার মুক্ত করার নিয়ম-নীতিকে কামান বলা হয়। কামান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। 'ক' কার, 'া' কার, 'ম' কার, 'া' কার এবং 'ন' কার অক্ষরগুলির সংযুক্তিতে কামান শব্দটি গঠিত। তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে ক কার অক্ষরটি সৃষ্টির আধার শক্তি ব্রহ্মযোনি অর্থ প্রকাশ করে। 'া' কার (আ অক্ষরের প্রতীক চিহ্ন) অক্ষরটি বায়ু অর্থ প্রকাশ করে। ম কার অক্ষরটি সৃষ্টির একমাত্র উৎস ব্রহ্ম অর্থ প্রকাশ করে। ন কার অক্ষরটি নেতিবাচক অর্থাৎ না সূচক অর্থ প্রকাশ করে। এতৎ সূত্রে ক কার যুক্ত 'া' কার অর্থ ব্রহ্মযোনিতে বায়ু নাই। ম কার যুক্ত 'া' কার অর্থে ব্রহ্ম এতে বায়ু নাই। বায়ুহীন ব্রহ্মযোনিতে এবং বায়ুহীন ব্রহ্মে সৃষ্টি অসম্ভব। অতএব কামান শব্দে অপর জন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর অথবা পুনরায় জন্ম অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না অর্থ প্রকাশ করে। তাই কুড়মালি সংস্কৃতির কামান কিরিআতে জন্মান্তরবাদ এবং পুনর্জ্জন্মবাদ বিরোধী নেগ-চার অর্থাৎ নিয়ম সংস্কার পালন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুড়মালি সংস্কৃতির কামান কিরিআতে জন্মান্তবাদ এবং পুনর্জন্মবাদ বিরোধী নেগ-চার অর্থাৎ নিয়ম-সংস্কার পালন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুড়মালি সংস্কৃতির কামান কিরিআ জন্মান্তরবাদ এবং পুনর্জন্মাবাদ বিরোধী হওয়ার আধারে ব্রাহ্মন্যবাদ বিরোধী হওয়ার ও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- প্রথমত জন্মান্তরবাদ এবং পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস আধারে ব্রাহ্মন্যবাদ গঠিত। দ্বিতীয়ত ভারতভূমিতে ব্রাহ্মণ্যবাদ অর্থাৎ আর্য্যাগমনের বহু পূর্বে কুড়মালি

সংস্কৃতি গঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়ত কুড়মালি সংস্কৃতির কামান কিরিআতে নিজ ভাগ্নে নাইআঁর কাজ করে। তাই কামান কিরিআর নাইআঁ পরিবর্তনশীল। যেমন ঃ- আমার কামান কিরিআতে আমার ভাগ্নে নাইআঁ। আমার ছেলের কামান কিরিআতে তার ভাগ্নে নাইআঁ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়মে বংশ পরম্পরাগত একি বংশের ব্যক্তি পুরোহিতের কাজ করার অধিকারী। চতুর্থত ব্রহ্মন্যবাদ বেদ আধারিত, তাই মন্ত্রমূলক। কিন্তু কুড়মালি সংস্কৃতি তন্ত্র সাধনা আধারিত তাই ক্রিয়ামূলক।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে কামান করা দিনের ভিন্নতা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন - ভ্রুণ অথবা মৃত্যু শিশুর জন্ম হওয়াতে অথবা জন্মের পর মুহূর্তে মৃত্যু ঘটলে কামান করা হয় না অর্থাৎ অশৌচ পালন করা হয় না। একদিন থেকে নবম দিবসের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে কামান করা হয় না কিন্তু নাঁউআঠাকুর অর্থাৎ নাপিতকে দিয়ে অশৌচ দূরীকরণ করা হয়। দশম দিবস থেকে অন্নপ্রাশন না হওয়া কালের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে তিনদিন অশৌচপালন করা হয় এবং অশৌচদূরীকরণের সাথে পিন্ড দানবিহীন কামান করা হয়। অন্নপ্রাশনের পর বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বকালের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে পাঁচদিন অশৌচ হয়। অন্নপ্রাশনের পর বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বকালের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে পাঁচদিন অশৌচ পালন করা হয় এবং অশৌচ দূরীকরণের সাথে সাথে পিন্ড দান দিয়ে কামান করা হয়। বিবাহ হওয়ার পর যে কোনো বয়সের ব্যক্তির যদি তার পিতা -মাতা ভভয়ে অথবা উভয়ের মধ্যে যে কোনো একজনের জীবদ্দশাতে মৃত্যু ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে সাতদিন অশৌচ পালন করা হয়। এবং কামান করা হয়। বাকী সকলের ক্ষেত্রে দশদিন অশৌচ পালন করা হয় অর্থাৎ দশ দিনের দিনে ঘাট কামান এবং এগারো দিনের দিন পিন্ডদান কামান কিরিআ করা হয়।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে মুরদারকে অর্থাৎ শবকে ডউরকপিন অর্থাৎ কৌপিন পরানো থেকে শুরু করে ছাঁহেঁর ঝিঁকা তড়িক অর্থাৎ ছায়া ঢোকানো পর্যন্ত কোনো কাম সরাউঅনে অর্থাৎ কর্ম সম্পাদনে ব্রাহ্মন পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেমন ঃ- ১) মুরদারকে ডউরকপিন পিঁধাউঅন অর্থাৎ শবকে কৌপিন পরানো। কুড়মালি সংস্কৃতিতে শব এর পরিহিত বস্ত্র খুলে দেওয়া হয় এবং নববস্ত্রের ডউরকপিন অর্থাৎ কৌপিন পরানো হয়। এই সংস্কারটি পুরুষের ক্ষেত্রে গুষ্ঠিক অর্থাৎ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত পুরুষেরা এবং মহিলার ক্ষেত্রে মহিলাগণ করে। এই সংস্কার সম্পাদনে কোনো যাগ-যজ্ঞ কিম্বা মুখ বানিয়ে মন্ত্র আওড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না।

ডউরকপিন পরানোর বিজ্ঞান সম্মত কারণ তন্ত্র সাধনা সাধার সময় সাধকের পরিধেয় বস্ত্র ডউরকপিন অর্থাৎ কৌপিন। কুড়মি জাতি তন্ত্র সাধক অর্থাৎ তান্ত্রিক। তন্ত্র সাধকের জীবনের লক্ষ্য মোক্ষ লাভ। মুরদার অর্থাৎ শব তার জীবদ্দশাতে আজীবন তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটানোর পথ প্রশস্ত করে এবং মরণ কালে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে বিলীন করে দেয়। মুদদারের অর্থাৎ শবের জীবাত্মা সুনিশ্চিতভাবে পরমাত্মার সাথে মিলবে কারণ সে তন্ত্র সাধক ছিল তাই ডউরকপিন পরিয়ে তাকে তন্ত্র

সাধকের সাজে সজ্জিত করা হয়। তন্ত্র সাধক কুড়মি জাতি তন্ত্র সাধনা পথে জীবন অতিবাহিত করে তাই তারা মোক্ষ লাভ করে। মোক্ষ লাভ করা জীবের জন্মান্তর অথবা পুর্নজন্ম হয় না। তাই কুড়মি জাতি জন্মান্তর অথবা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে না।

২) হাড়ে হেরেইদ অর্থাৎ হাড়ে হলুদ ঃ -

কেবল মাত্র মূল্য নয় সকল জীবের দেহ জীবকোষ দ্বারা গঠিত। জীবের মরণের পর সেই জীবকোষগুলি দূষিত বীজানুতে পরিনত হয় এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে। উক্ত জ্ঞান কুড়মি জাতির মগজে থাকার দরুন তারা মুরদারের অর্থাৎ শবের সারা শরীরে হলুদ লেপন করে দেয়। শবের শরীরে হলুদ লেপন করে দেওয়াকে হাড়ে হেরেইদ বলা হয়।

হলুদ দূষিত বীজাু সৃষ্টিরোধক এবং সংক্রামক রোগ প্রতিযেধক গুণ সম্পন্ন দ্রব্য। এই সংস্কারটি স্বগোত্রীয় মহিলাগণ পালন করে। এই সংস্কারটি পালন করা কালে যদি দেখা যায় স্ত্রীর জীবদশাতে স্বামীর মৃত্যু ঘটে তাহলে স্ত্রীর হাতে পরিহিত শাঁখা-চুড়ি ভেঙে দেওয়া হয়, সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়। সিঁথিতে সিঁদুর এবং শাঁখা-চুড়ি ভেঙে দেওয়া হয়, সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়। সিঁথিতে সিঁদুর এবং শাঁখা-চুড়ি অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জিতা থাকা রজঃ গুণবতীর পরিচায়ক। রজঃগুণ সৃষ্টি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী সৃষ্টি করা গুণের অধিকার হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টি করার অধিকার তার থাকে না কিন্তু ঐ মুহূর্তে সে রাঁড়ি অর্থাৎ অর্থাৎ বিধবাতে পরিণত হয় না। কারণ ঐ সময় তার হাতে পরিহিত লোহার খাড়ু খুলে দেওয়া হয় না। যতক্ষণ তার হাতে লোহার খাড়ু পরিহিত থাকে ততক্ষণ সে রাঁড়ি অর্থাৎ বিধবা হয় না। কামান দিনে ঘাট স্নান কালে তার হাতে পরিহিত লোহার খাড়ু খুলে পুকুরে বিসর্জন করা হয়। লোহার খাড়ু বিসর্জন করার পর সে বিধবা হয়। রোগ প্রতিষেক, সন্তান জন্মানো অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বৈধব্য প্রাপ্তি ঘটার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পালন কালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না অর্থাৎ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়ে না।

মেইরঘাটা লেগন অর্থাৎ শশ্মানে নিয়ে যাওয়া—কুড়মালি সংস্কৃতিতে মুরদারকে অর্থাৎ শবকে বহন করে শশ্মানে নিয়ে যাওয়া প্রথম অধিকারী স্বঔরসজাত পুত্র, অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র তথাপি অভাব না মিটলে স্বগোষ্ঠীর পুত্র স্থানীয়গণ বহন করার বিধি স্বীকৃত আছে। কুড়মি জাতি বংশ পরম্পরাগত প্রবহমান জলস্রোত কিনারে নির্ধারিত একই স্থানকে মেইর ঘাটা অর্থাৎ শশ্মানরূপে ব্যবহার করে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে মুরদারকে অর্থাৎ শবকে মাটিতে পোঁতা এবং দাহ করা দুটো প্রথাই প্রচলিত আছে। তথাপি পোঁতা এবং দাহ করার মধ্যে কিছু বাধা-নিষেধ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ- সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তদেরকে দাহ করা হয় না। মাটিতে পোঁতা হয়। গর্ভবতী মহিলাকে দাহ করা হয় না। ভ্রূণ থেকে কিশোর বয়সীদেরকে দাহ করা হয় না। জ্বালানীর অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কোনো ক্ষেত্রে কারুকেই দাহ করে না। এরদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় দাহ করা বাধ্যবাধ্যকতা নয়। এতৎসূত্রে আমার ধারণা সুদূব

অতীতে কুড়মি সমাজে দাহ করা প্রথা ছিল না।

৩) মুরদারকে অর্থাৎ শবকে শশ্মানে নিয়ে যাওয়ার পথে গাঁউ মুঁড়াই অর্থাৎ গ্রামের শেষপ্রান্তে ক্ষণকালের জন্য বহনকারীদের কাঁধ থেকে নামানো হয় এবং খাটিয়ার চার পায়ার মধ্যে এক পায়া বাদ দিয়ে তিন পায়ার মাথাতে তুলা রেখে দেওয়া হয়। তুলা হাল্কাতম দ্রব্য । পায়ার মাথাতে রাখার সাথে সাথে উড়ে যায়। কুড়মালি সংস্কৃতির এই সংস্কার পালনের মধ্যে কোনো বিজ্ঞান আছে কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ।

আমার ধারনা গরাম ঠাকুরকে ওয়াকিবহাল করা হয় এবং আদেশ গ্রহণ করা হয় যে আমরা সেই ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি যার শরীরে একলক্ষ্য বায়ু তরঙ্গ হ্রাস পেয়ে মাত্র দশ শতাংশ বায়ু তরঙ্গায়িত আছে অর্থাৎ যে মারা গেছে অর্থাৎ যে মুরদারে অর্থা শবে পরিণত হয়েছে। খাটিয়ার তিন পায়ার মাথাতে তুলারাখা এবং তুলা উড়ে যাওয়া এক লক্ষ বায়ু তরঙ্গ থেকে হ্রাস পাওয়ার ইঙ্গিতবাহী। এক পায়া বাদ দেওয়া দশ শতাংশ বায়ু তরঙ্গায়িত হওয়ার ইঙ্গিতবাহী।

গরামঠাকুরকে ওয়াকিবহাল করা এবং আদেশ গ্রহণ করার কারণ গরাম ঠাকুর গ্রামের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ঝরা-খরা, রোগ-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু সব কিছুর পরিত্রাতা। কামান সমাপ্ত অর্থাৎ ছাঁহেইর ঝিকা অর্থাৎ ছায়া ঢোকানো সংস্কার পালিত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যের জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে পারে না। তাই উক্ত সময়কাল পর্যন্ত সেই জীবাত্মা জাহিরবুড়িমাঁই এর কোলে আশ্রয় লাভ করে পরিত্রাণ পাওয়ার যোগসূত্র স্থাপন করা। এই সংস্কার পালন করাকালে ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়ে না। শ্মশানে পৌঁছানোর পর শবের মাথা উত্তর দিকে অবস্থান করবে এইভাবে বহনকারীগণ খাটিয়া নামিয়ে মাটিতে রাখে। দাহ করার ক্ষেত্রে যেখানে কুড়মালি ভাষাতে স এবং বাংলা ভাষাতে চিতা অথবা কুড়মালি ভাষাতে গাড়হা এবং বাংলা ভাষাতে গর্ত খনন করা হয় সেই জায়গাটার ঘাস, আগাছা, আবর্জনা কোদালে ছেঁচে পরিস্কার করা হয়। মাটিতে পোঁতার ক্ষেত্রে মুরদার অর্থাৎ শবকে গাড়হা অর্থাৎ গর্তে ভাসানোর পূর্ব এবং দাহ করার ক্ষেত্রে শবকে স অর্থাৎ চিতাতে শোয়ানোর পূর্ব্বে নাপিত মুরদারের অর্থাৎ শবের বাম হস্তের কনিষ্ঠা আঙ্গুলির নখ টুঁগন অর্থাৎ নখ কেটে দেওয়া প্রথা কুড়মালি সংস্কৃতিতে প্রচলিত আছে। কুড়মি সমাজ বিশ্বাস করে নাপিত নখ কেটে দেওয়াতে সকল প্রকার অশৌচ দূর হয় অর্থাৎ শুদ্ধ হওয়া যায়। শৌচ-অশৌচ বিচার সুস্থ মস্তিষ্কে জীবন্ত অবস্থাতে। পাগল শৌচ-অশৌচ বিচার করে না। মৃত্যের অর্থাৎ মুরদারের অর্থাৎ শবের শৌচ-অশৌচ বিচার অবান্তর, অবাস্তব, অকল্পনীয়। মৃত্যুর কারণে জীবন্তদের অশৌচ হয়। মৃত্যের অশৌচ অযৌক্তিক, হাস্যস্কর। তথাপি বিজ্ঞান আধারে গঠিত পৃথিবীর প্রাচীনতম সর্বশ্রেষ্ঠ কুড়মালি সংস্কৃতিতে শবের নখ কাটা সংস্কার পাওয়া যায় সুদূর অতীতে সিন্ধুবাসী তান্ত্রিক কুড়মির মধ্যে শবকে মাটিতে পোঁতা এবং হাড়সালিতে মৃত্যের অর্থাৎ শবের হাড় পোঁতা প্রথা প্রচলিত ছিল। তাদের বিচারে দাহ করা অপরাধের ছিল। কারণ

জীবদ্দশাতে সারাজীবন তন্ত্র সাধনার দ্বারা সিদ্ধ করা দেহের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গকে অগ্নিতে জ্বালিয়ে মুহুর্তের মধ্যে বিনষ্ট করা তন্ত্রধর্ম বিরোধী। প্রাকৃতিক নিয়মে যে পদ্ধতিতে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি সেই পদ্ধতিতেই তার বিনাশ হওয়া ধর্মের। যে সকল উপাদান দিয়ে দেহের সৃষ্টি সেই সকল উপাদানের মধ্যে হাড়ের স্থায়িত্ব অধিক। ক্ষণস্থায়ী উপাদানবিনষ্ট হওয়ার দরুন সৃষ্ট হানিকারক বীজানুতে আক্রান্ত হয়ে হাড়ের স্থায়িত্বে হানি পৌঁছানোর হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে হাঁড় পোঁতা শ্রেয় বিবেচনা করার হাত ধরে হাড় পোঁতা প্রথার প্রচলন ঘটিয়েছিল। যেভাবে সকল মুরদারকে অর্থাৎ শবকেএকি স্রোতস্নীর নির্ধারিত বেলাভূমির মাটিতে অর্থাৎ মেইরঘাটাতে পোঁতা হয়। তদ্রুপ সকল মৃত ব্যক্তির হাড় শুকনো গুণ সম্পন্ন নির্ধারিত একই প্রশস্ত মাঠে পোঁতা হয়। উক্ত মাঠটি হাড়সালি নামে পরিচিত। হাড়সালি শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। ভাষা বিজ্ঞান সম্মতভাবে হাড়সার শব্দটি হাড়সাল শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং হাড়সাল শব্দ থেকে হাড়সালি শব্দের উৎপত্তি। কুড়মালি সংস্কৃতিতে হাড়শালিতে হাড় পোঁতা তন্ত্র ধর্ম অবশ্য পালনীয় এবং ধর্মের বিষয়। তন্ত্রধর্মে মুরদারের অঙ্গহানি ঘটানো অধর্ম। এমতাবসথাতে হাঁড় সংগ্রহ করা অসম্ভব। অগত্যা হাড়ের প্রতীক অনুসন্ধান করা অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেহের মধ্যে হাড়, দাঁত এবং নখের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে হাড়ের প্রতীক নখপোঁতা যুক্তিযুক্ত চিন্তা করেছিল তাই হাড়সালিতে হাড়ের প্রতীক নখ পোঁতা প্রথার প্রচলন ঘটে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হাড়কে সুরক্ষিত রাখা তাই হাড়সালি নামে নামকরণ করা হয়েছিল। নখ কেটে নেওয়াতে অঙ্গহানি ঘটে না কিন্তু দাঁত ভেঙে নেওয়াতে এবং মাংস কেটে হাড় বের করে নেওয়াতে অঙ্গহানি ঘটে। এতৎ কারণে বর্ত্তমান যুগে ও কুড়মি সমাজের মধ্যে নাউআঁঠাকুর অর্থাৎ নাপিতকে দিয়ে মুরদারের অর্থাৎ শবের নখ কাটানো প্রথা স্বমহিমায় বিরাজমান কিন্তু হাড়সালিতে হাড়ের প্রতীক নখ পোঁতা কল্পনাতীত।

নাপিতকে দিয়ে মুরদারের নখ কাটানো অতীতে হাড়সালিতে হাড়ের প্রতীক নখ পোঁতা প্রথা প্রচলিত থাকার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এরদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় কুড়মির হাড়সালি ছিল।

প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে এবং বর্ত্তমান যুগে ও তান্ত্রিকদের অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া করার প্রথা দাহ করা নয়, কবর দেওয়া অর্থাৎ মাটিতে পোঁতা প্রথা প্রচলিত থাকা সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় কুড়মালি সমাজে দাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তন্ত্র ধর্ম্মের স্রষ্টা এবং ধারক ও বাহক কুড়মি জাতি সমাজগতভাবে তান্ত্রিক ছিল এর প্রমাণ এদের ধর্মাচরণের পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। এরদ্বারা তর্কাতীত ভাবে বলা যায় সুদুর অতীতে আর্যাগমনের পূর্বে কুড়মি সমাজে দাহ করা প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান যুগে কুড়মি সমাজে প্রচলিত থাকা অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া করার পদ্ধতির মাধ্যমে ও প্রমাণ পাওয়া যায়। কুড়মি সমাজে দাহ করা বাধ্যবাধ্যতার মধ্যে পড়ে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষেধের মধ্যে পড়ে। যেমন- সংক্রামক ব্যাধি গ্রস্তের ক্ষেত্রে দাহ করা নিষেধ। গর্ভবতী নারীকে দাহ করা নিষেধ। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দাহ করা নিষেধ। অবিবাহিত প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও দাহ করা বাধক তার মধ্যে

পড়ে না। জ্বালানির অভাবগ্রস্তরা দাহ করে না। দাহ করা যদি বাধ্য বাধ্যকতার মধ্যে পড়তো তাহলে হাড়ের প্রতীক নখ ব্যবহার করা হোত না। শুধু তাই নয়, দাহ করা তন্ত্র ধর্ম্মে অপরাধ। এরদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় সুদূর অতীতে কুড়মি সমাজে দাহ করা প্রথা প্রচলিত ছিল না।

৪) কুড়মালি ভাষাতে মুঁহেঁ আইগ এবং বাংলা ভাষাতে মুখাগ্নি ঃ-

কুড়মালি সংস্কৃতিতে জ্যেষ্ঠপুত্র অভাবে কনিষ্ঠপুত্র তথাপি অভাব নামিটলে যে কোনো পুত্র মুখাগ্নি করার অধিকারী। যার স্বঔরসজাত পুত্র থাকে না সেক্ষেত্রে ভ্রাতুষ্পুত্র মুখাগ্নি করার অধিকারী। অনেকের বিশ্বাস কুড়মালি সংস্কৃতিতে অতীতে মুখাগ্নি করা সংস্কার ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন নীতির পথে এটি সংযোজিত হয়েছে। এই সংস্কারটির মধ্যে আদৌ কোনো বিজ্ঞান আছে কিনা না যদি থেকে থাকে তাহলে সেটি ব্রহ্মন্যবাদগত অথবা কুড়মালিবাদগত সে বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আসুন অনুসন্ধানের চেষ্টা করি। প্রথমত- এই সংস্কার পালন করা কালে কুড়মি জাতি কোনো ব্রাহ্মণ পন্ডিত দিয়ে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করানোর প্রমাণ পাওয়া যায় না। মন্ত্রবিহীনভাবে তারা নিজেরা করে। বরং নাউআঁঠাকুরের অর্থাৎ নাপিতের ভূমিকা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন - মুখাগ্নি করা কালে নাপিত তার বাম হাত দিয়ে মুখাগ্নিকরাকারীর বাম চোখ ঢেকে কানা অর্থাৎ বাম চোখকে দৃষ্টিহীন করে এবং চিতা অথবা গর্ত্তের চারিদিকে আড়াইবার প্রদক্ষিণ করিয়ে মুখাগ্নি করানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত- কুড়মালি সংস্কৃতিতে যদি পিন্ড দান সংস্কার স্বীকৃত হয় তাহলে মুখাগ্নি করা সংস্কারকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ যে মুখাগ্নি করে সেই তো পিন্ড দান করার অধিকারী। এই প্রথা নির্ধারিত থাকার কারণে পিন্ডদান করার বিষয়ে ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না।

মূল বিষয় মুখাগ্নি করা সংস্কারটির বিজ্ঞান অনুসন্ধান করা। জীবের জীবন্ত থাকার উপায় শরীরে সঠিক পরিমাণে তেজ, ব্রহ্ম এবং বায়ুকে সঠিক ক্রিয়াশীল রাখা। বায়ু ভগবৎদত্ত। জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা জীবের শরীরে ক্রীয়াশীল রাখে। পরিমান মাফিক আহার্য দ্রব্য আহার করতে সাহায্য করে জিহ্বা। দ্রব্যের স্বাদ আস্বাদন করার ক্ষমতা একমাত্র জিহ্বার থাকে। জীবের মৃত্যুর পর ও এক নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত জিহ্বার স্বাদ আস্বাদন করা গুণ নষ্ট হয় না। জিহ্বার এই গুণ সক্রিয় থাকার দরুণ জীব সুস্বাদু এবং রুচিকর আহারের প্রতি আকর্ষিত হয়ে থাকে। মৃত্যুর পরও মৃত্যের জিহ্বার যেন পার্থিব সুস্বাদু আহার্য দ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত না হয় এবং মোক্ষ লাভের পথে বাধা সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে মুখাগ্নির মাধ্যমে জিহ্বার স্বাদ আস্বাদন গুণ নষ্ট করে দেওয়া চিন্তন থেকে মুখাগ্নি করন। এই চিন্তন, এই জ্ঞান জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তি মার্গ দিয়ে পারে না। কারণ উক্ত মার্গগুলি জন্মান্তর এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। একমাত্র তন্ত্র ধর্ম অর্থাৎ তন্ত্র সাধনা মোক্ষ লাভ বিশ্বাস করে। তন্ত্র সাধনার দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায়। তন্ত্র সাধনা অর্থাৎ তন্ত্র ধর্মের প্রবর্ত্তক কুড়মি জাতি। প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকে অদ্যাবধি কুড়মি জাতি পুরুষ ও প্রকৃতির উপাসক। পুরুষ ও প্রকৃতির আরাধনা, উপাসনার হাত ধরেই তন্ত্র ধর্মের সূচনা। কুড়মালি ভাষার তন যুক্ত তঁত অর্থাৎ তনতঁত শব্দ থেকে তন্ত্র

শব্দটির উৎপত্তি। কুড়মালি ভাষার তন শব্দের অর্থ তনের অর্থাৎ শরীরের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সন্ধান। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অংশ, উপাদানের গুণাগুনের সন্ধান দিতে পারে একমাত্র তন্ত্র সাধনা। জিহ্বার স্বাদ আস্বাদন গুণের এবং সক্রিয় থাকার সন্ধান দেয় তন্ত্র সাধনা তৎসূত্রে মুখাগ্নি করা সংস্কারটি অবশ্যই কুড়মালি সংস্কৃতির সংস্কার। আমার ধারনা কুড়মালি সংস্কৃতি থেকে মুখাগ্নি করা সংস্কারটি ব্রাহ্মণ্যবাদ সংস্কৃতি হরণ করেছে। এটাই তো ব্রাহ্মণ্যবাদের ধর্ম্ম।

৫) কুড়মালি ভাষাতে কুসে পানি ঢার বাংলা ভাষাতে কুসে জল দান ঃ-

কুস এক প্রকার ঘাস। প্রবহমান জলস্রোত কিনারাতে জন্মায়। এর কন্দ অর্থাৎ কাঁদা এতটাই প্রাণবন্ত যে একবার মাটিতে নিহিত অর্থাৎ রোপিত হওয়ার সুযোগ পেলে বিনাশ ঘটে না। একটার পর একটা অঙ্কুরের পাতা গজাতে থাকে। দাহ করা অথবা মাটিতে পোঁতা সমাপ্ত হওয়ার পর দাহ করার ক্ষেত্রে দাহস্থলের আগুন নেভানো হয়। চেড়রি খুঁটা অর্থাৎ খুঁটি তোলা হয়। কুড়মালি ভাষার চাড়রি শব্দ থেকে চেড়রি শব্দটির উৎপত্তি। যে খুঁটার মাথাতে এবং গায়ে শাখা-প্রশাখা, পাতা থাকে না সেই খুঁটাকে চাড়রি অর্থাৎ চেড়রি খুঁটা বলা হয়। চেড়রি খুঁটা তোলার পর সেই গর্তে ধানের খৈ পোঁতা হয়। তারপর দাহস্থলে মাঝখানে বালির ছোট ঢিপি করা হয় এবং তাতে কুস ঘাসের পাতা পোঁতা হয়। মাটিতে পোঁতার ক্ষেত্রে মাটির ঢিপির মাঝখানে বালির ছোট ঢিপি করা হয় এবং তার উপর কুস ঘাসের পাতা সোজাসুজি ভাবে পোঁতা হয়। স্বগোষ্ঠীর সকলে আঁজলাতে করে জল ঢেলে কুস ঘাসের পাতাটিকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। একেই বলে কুসে পানি ঢার।

যুগ পরম্পরা সংস্কারটি পালিত হয়ে আসছে। তাই বিনাশ বিরহিত গুণসম্পন্ন কুস ঘাসকে অন্ত্যেষ্ঠী ক্রিয়াতে সংযোজনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা উচিত। আমার ধারণা পরমব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার বিনাশ না ঘটা গুণের সাথে কুস ঘাসের মূল অর্থাৎ কাঁদার বিনাশ বিরহিত গুণের গুণগত সাদৃশ্য কুড়মি জাতি উপলব্ধি করেছিল। এবং তন্ত্র সাধনার দ্বারা প্রমাণ পেয়েছিল জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। জীবের অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু জীবের অর্থাৎ মানুযের কর্মময় জীবনের কর্ম সংস্কার মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কুস ঘাসের মূল থেকে পাতাকে ছিঁড়ে ফেলা পাতাকে বালির ঢিপিতে পোঁতা এবং জল ঢেলে সেটাকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার অর্থ হয় সেটা শুষ্ক হবে না হয় পচে যাবে। এই শুষ্ক হওয়া না হয় পচে যাওয়া জীবের অর্থাৎ মানুযের কর্মসংস্কার মুক্ত হওয়ার প্রতীক। তন্ত্র সাধনার দ্বারা কুড়মি জাতি জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে। অতএব তাদের কর্মময় জীবনের কর্ম সংস্কার মুক্ত জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যায় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে। মোক্ষ লাভ করার অর্থ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া। অর্থাৎ জন্মান্তর এবং পুনর্জনম থেকে মুক্তি পাওয়া। কুড়মালি সংস্কৃতির কুসে পানি ঢার সংস্কার জন্মান্তর এবং পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করার সাক্ষ্য বহন করে । প্রথমেই

বলা হয়েছে কুসে পানি ঢার সংস্কারটি পালন করা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। গোষ্ঠীবহির্ভূত কুড়মি পর্যন্ত এই সংস্কার পালনে অশুভ। অতএব ব্রাহ্মণ শুধু অশুভই নয় অশুচিও বটে। এতৎসূত্রে বলা হয় " অকর কুসে পানি ঢার দেউঅইআউ কেউ এ নিঁহি রহলেথিক'।

কুড়মালি ভাষাতে ঝুলি পাখলান এবং বাংলা ভাষাতে বস্ত্র প্রক্ষালন - কুসে পানি ঢার সংস্কার সমাপনান্তে ব্যবহৃত শশ্মান স্থলকে জল ঢেলে প্রক্ষালন করে এবং একসাথে স্রোতস্নি তট থেকে হরি বল ধ্বনি দিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। একেই বলা হয় ঝুলি পাখলান। কুড়মালি সংস্কৃতিতে মৃত্যের যেদিন মৃত্যু ঘটুক না কেন ঝুলি পাখলন দিন থেকে অশৌচ পালন করা শুরু হয়।

এক্ষেত্রে ও কোনো বেদ বাক্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী মন্ত্র আওড়ানো হয় না। বরং হরি বল ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করা হয়। কুড়মির এই হরি বল মাহামন্ত্র বেদে গোচরীভূত নয়। তাই তো বলা হয়েছে ঃ- হরি নাম দ্বি অক্ষর। বেদে যাহা অগোচর।।

কুড়মালি ভাষাতে দবাটে কাঁটা সাটন বাংলা ভাষাতে চৌরাস্তারমাথা কন্টকাকির্ন করা ঃ দবাটে শব্দটির দ অক্ষরটি দু বা দুই অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। বাট শব্দ থেকে বাটে শব্দটির উৎপত্তি। দবাটে শব্দে দুই রাস্তার মিলন স্থল বোঝা যায়। কাঁটা সাটন এবং বাংলা কন্টকাকির্ন করা। দবাটে কাঁটা সাটন এর বাংলা চৌরাস্তার মাথা কন্টকাকির্ণ করা। দবাটে কাঁটা সাটন নেগ মানন অর্থাৎ নিয়ম পালনের বিজ্ঞান সম্মত কারণ মৃত্যের অবিনাসী জীবাত্মা সংস্কার বশত আকর্ষিত হয়ে যেন প্রিয় জনের, প্রিয় বস্তুর, প্রিয় ভূখন্ডের সংস্পর্শে যেতে না পারে তাই চারিদিকের পথ অবরোধ করা।

এক্ষেত্রেও হরি নাম দি অক্ষর। বেদে যাহা অগোচর।। সেই হরিবল ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে মৃত্যের অবিনাশী জীবাত্মার আবাসস্থল জাহিরাথান নির্ধারণ করা আছে। বায়ুমন্ডলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো বিশ্বাস করে না।

৬) তিনসিনান / তিতা ভাত / তেল খেঁইর বাংলা ভাষাতে তিনস্নান / তেতো ভাত তেলখৈল ঃ-

ঝুলি পাখলান দিন থেকে তৃতীয়তম দিবসে উক্ত সংস্কার পালন করা হয়। উক্ত সংস্কারটি পুরোপুরি পুরুষ বর্জিত সংস্কার। বিবাহ অথবা সাঁঘার মাধ্যমে যে সকল রমনীগণ পৈতৃক গোষ্ঠী থেকে বহির্ভূত হয়ে শশুরের গোষ্ঠীভুক্ত হয় সেই সকল রমনীগণ উক্ত সংস্কার পালন করতে বাধ্য। উক্ত শ্রেণীর মহিলাগণ পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত অশৌচ পালনে বাধ্য নয়। তারাকে তিন দিন অশৌচ পালন করতে হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে তৃতীয় দিবসে তেলখৈল সংস্কারের মাধ্যমে তারা অশৌচ মুক্ত হয়। বংশ পরম্পরাগত নির্ধারিত ভাবে যে পুকুর পাড়ে অথবা নদী ঘাটে ঘাট কামান করা হয়ে থাকে সেই পুকুর পাড়ে অথবা নদী ঘাটেতেই উক্ত সংস্কার পালন করা হয়। মৃত্যের বাড়ী থেকে নাপিত তেল, খৈল নিয়ে পুকুর পাড়ে অথবা নদী

ঘাটে ঘাট বসায়। গোষ্ঠীভূক্ত এবং গোষঠীবহির্ভত সকল মহিলা একজোট হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উক্ত ঘাটে হাজির হয়। গোষ্ঠীবহির্ভূত রমনীগণ নাপিতের নিকট নককাটে নাপিতের বসানো ঘাটের তেল মালিশ করে খৈল এবং গগলি স্পর্শ করে। গোষ্ঠীভক্তগণ কেবলমাত্র তেল মালিশ করে সকলে একসাথে স্নান সারে এবং বাড়ি ফিরে। গোষ্ঠীবহির্ভূতগণ নাপিতের নিকট নখ কাটিয়ে খৈল এবং গগলি স্পর্শ করে অশৌচ মুক্ত হয়।

গোষ্ঠীভুক্তদের খাদ্যান্ন তেতো করা হয়। ঐদিন তারা তেতো ভাত ভক্ষণ করে। তেতো ভাত মানে কটু খাদ্য। যেহেতু তারা নিজেরা কটু খাদ্য গ্রহণ করে তাই সংস্কারবশতভাবে ও মৃত খাদ্যের লালসাতে তাদের নিকট খাদ্য চাইতে যাবে না। তেতো ভাত গ্রহণ করা মৃত্যের খাদ্য লালসা সংস্কার মুক্তির পরিচায়ক।

৭) দশম দিবসে ঘাট ঃ-

ঘাট শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষাতে এর অর্থ দুর্গম পথ এবং নদী তীরে অথবা পুকুর পাড়ে স্নানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। দশম দিবসে ঘাট। এক্ষেত্রে ঘাট শব্দটি দুর্গম পথ অর্থে প্রধানত ব্যবহার হয়েছে। যেমনঃ- প্রথমত জীবিতদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের মত দুর্গম পথ অতিক্রম করা। দ্বিতীয়ত মৃত্যের ক্ষেত্রে জন্মান্তরে এবং পুনর্জন্মের যাওয়ার পথ দুর্গম পথে পরিণত হওয়া। কারণ তার ফেলে যাওয়া কমর্ময় জীবনের কর্মসংস্কার মুক্তির প্রক্রিয়া একাদশ দিবসে কামান কিরিআর মাধ্যমে হতে যাওয়ার সূচনা এই ঘাট।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে নির্দিষ্টভাবে দশম দিবসে ঘাট সংস্কার পালনের তাৎপর্য নবদ্বার মানব দেহে বিরাজমান। কিন্তু বিরাজমান এই নবদ্বারে মানবের সৃষ্টি হয় না। মানবের সৃষ্টি দশম দ্বারে। নারী-পুরুষের যৌন মিলন কালে উক্ত দশম দ্বার উন্মোচিত হয়। সেই দশম দ্বার দিয়ে পুরুষের শুক্রানু এবং নারীর ডিম্বানু ব্রহ্মযোনিতে মিলিত হয়। সেই মিলনের ফলে মানবের সৃষ্টি। দশম দিবসে ঘাট সংস্কার পালনের মাধ্যমে মৃত্যের দশম দ্বারে যাওয়া অর্থাৎ জন্মান্তরে অথবা পুনজর্ন্মে যাওয়ার পথ দুর্গম পথে পরিণত করার সূচনা করা।

দশম দিবসে নাপিত মৃত্যের বাড়ী থেকে তেল এবং খৈল নিয়ে পুকুর অথবা নদী ঘাটে তেল, খৈল এবং গললি সংগ্রহ করে ঘাট বসায়। মৃত্যের গোষ্ঠীভুক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নাপিতের কাছে চুল, দাঁড়ি, নখ কাটিয়ে ঘাটে বসানো তেল মালিশ করে খৈল এবং গগলি স্পর্শ করে স্নান করে অশৌচমুক্ত হয়। সূর্যাস্তের পর যারা পিন্ডদানের অধিকারী অর্থাৎ পিতা-মাতার ক্ষেত্রে পুত্র এবং পুত্রস্থানীয় সকলে এবং পুত্র অথবা অবিবাহিতা কন্যার ক্ষেত্রে পিতা অথবা পিতৃস্থানীয় যে কেহ অর্থাৎ কাকা অথবা জ্যেষ্ঠামশায় মাথা মুন্ডন করে খৈল এবং গগলি স্পর্শ করে স্নান সেরে নববস্ত্র পরিধান করে ঘাটে দাঁড়ায়। নিজ ভাগ্নে সকলের কপালে রহিন মাটির টিপ দেয় এবং হরিবল ধ্বনি দিয়ে ঢাকের বাজনা সহকারে গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। গৃহে পৌঁছনোর পর ভগ্নি স্থানীয়গণ সকলের পদ প্রক্ষালন করে। ঘাট থেকে নিয়ে আনা জল তুলসী ঢিপিতে জল দান করে। যারা ঘাটে উঠে তারা ঐ দিন উপবাস পালন করে

কিন্তু ঘাটে উঠার পর ফল আহার করার প্রথা প্রচলিত আছে।

একাদশ দিবসে কামান ঃ-

কামান শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। 'ক' কার, 'া' কার, 'ম' কার 'া' কার ন কার অক্ষরগুলির সংযুক্তিতে কামান শব্দটি গঠিত। তন্ত্র সাধনা ক্ষেত্রে ক কার অক্ষরটি ব্রহ্মাযোনি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। 'া' কার অক্ষরটি বায়ু অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। ম কার ব্রহ্ম অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। 'া' কার বায়ু অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। সামগ্রিক ক কার, 'া' কার, ম কার, 'া' কার, ন কার কামান শব্দে ব্রহ্মযোনিতে বায়ু নাই, ব্রহ্ম বায়ু নাই, অর্থ প্রকাশ করে। বায়ু বস্তুকে ক্রিয়াশীল করে। বায়ুবিহীন অবস্থাতে বস্তু ক্রিয়াশীল হয় না। ব্রহ্মাযোনি যদি ক্রিয়াশীল না হয়, ব্রহ্ম যদি ক্রিয়াশীল না হয় তাহলে সৃষ্টি অসম্ভব। অতএব মৃত্যের সৃষ্টি হওয়া অর্থাৎ জন্মান্তর অথবা পুনর্জন্ম হওয়া অসম্ভব। কুড়মি জাতি জন্মান্তর এবং পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ একাদশ দিবসে কামান সংস্কার পালন।

৮) কামান দিনে প্রথম পদক্ষেপ পিনডি পাড়া ঃ-

মানব দেহ চিদ বিরোধী জড়বস্তু। দেহের ভোগ্যবস্তু ও চিদবিরোধী জড়বস্তু। সেই জন্য জড়দেহ জড়বস্তু ভোগ করে সুখ পায় আনন্দ পায়। তাই মানুষ জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জড়বস্তু ভোগ করার লালসা পোষণ করে। জন্মলগ্নে মাতৃদুগ্ধ পান করার লালসা পোষণ করে। মৃত্যুকালে ও কম পক্ষে সহজসাধ্য পানীয় বস্তু পান করার লালসা পোষণ করে। সেই আধারে কুড়মি জাতি কুড়মালি ভাষাতে উক্ত লালসা পোষণ করার বাস্তবিকতার প্রমাণ স্বরূপ প্রবাদ বাক্যের মতো বলে ' অমুককর হাঁথেক এক ঢক পানিক আসরাঁই এত্নাখন জিউইরহে। অমুককে এক ঢক পানি মুঁটাই দেলে ইঁনে অঁ জিউটা গেলেইক। এতৎ সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় জড়বস্তু ভোগ করার লালসা আমৃত্যুকাল প্রতিটি মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্মসংস্কার। যেহেতু মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্মসংস্কার খাদ্যের প্রতি লালসা পোষন করা সংস্কার তাই উক্ত সংস্কার মুক্তকরণের জন্য কুড়মালি সংস্কৃতিতে পিনডি পাড়া সংস্কার পালন করা হয়।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে, কুড়মি সমাজে পিনডি পাড়া সংস্কারের প্রাচীনতা বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। কিন্তু যা প্রমাণিত সত্য সেই আধারে বলা হয়, যে সময়কালে কুড়মি জাতি আরণ্যক জীবন পরিহার করে কৃষিকর্ম উদ্ভাবন করে এবং কৃষিকর্মের দ্বারা সর্বপ্রথম উৎপাদিত খাদ্য শস্যদানা যব উদর পুরনের একমাত্র শস্য দানা ছিল সেই সময়কাল নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ পিনডি পাড়া সংস্কার পালন করা যব খাদ্য শস্য দানা ব্যতীরেকে হয় না।

পিনডি তৈরী করার দ্রব্যসমূহ ঃ-

কৃষি কর্মের দ্বারা সর্ব প্রথম উৎপাদিত খাদ্য শস্য দানা যব, সর্বপ্রথম উৎপাদিত তৈল বীজ তিল, পরবর্তীকালে আবিস্কৃত হলে ও যবের পরিবর্তে কুড়মি জাতির প্রধান আহার্য্য শস্য দানাতে পরিণত হওয়া ধান শস্য দানার আতপচাল, গোমাতার নিকট হতে প্রাপ্ত কিন্তু খাদ্য বস্তুরূপে নিত্য ব্যবহার্য এবং কর্ম সংস্কারে পরিণত হওয়া দুধ, দই, ঘি এবং প্রকৃতি মাতার

নিকট হতে প্রাপ্ত বনজ মধু, যা অতীতে অর্থাৎ আঁখ (ইক্ষু) আবিস্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে মিষ্টতা স্বাদের অভাব পূরণ করতো।

পিনডি পাড়া শব্দদ্বয় কুড়মালি ভাষার শব্দ পিনডি শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ পিন্ড। পাড়া শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ ব্যাপক অর্থে দেওয়া কিন্তু এক্ষেত্রে যোগানো অর্থটি প্রযোজ্য।

পিনডি ঃ- যব, তিল, আতপচা, দুধ, দই, ঘি এবং মধুকে একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে মাখা হয় যাতে পরস্পর পরস্পরের গায়ে লেপটে থাকে। এই অবস্থাতে যে ঢেলা বানানো হয় সেই ঢেলাকে পিনডি বলা হয়। সর্বমোট নয়টি পিনডি বানানো হয়।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে পিনডি পাড়ার পদ্ধতি ঃ- দশম দিবসে ঘাট। ঘাটের পরদিন অর্থাৎ একাদশ দিবসে সকালবেলা প্রাতক্রিয়া সমাপন করে স্নান করে নববস্ত্র পরিধান করে শুদ্ধচিত্তে নিজ ভাগ্নে তুলসী টিবির সম্মুখে পূর্ব মুখে বালির তিনটি ঢিপি বানায়। ঢিপিগুলি আসন কল্পনা করা হয় তাই ঢিপিগুলিকে আসন সাজে সজ্জিত করা হয়। মাঝখানের আসনটি ধরম ঠাকুরের অর্থাৎ সূর্য দেবের আসন নিজ ভাগ্নের নির্দ্দেশে এবং সহযোগিতাতে পিনডি যোগানো ব্যক্তি প্রথম সূর্য্যদেবের আরাধনা করে, তারপর পিনডি পাড়ার নিয়ম যথা বাম হাঁটু মড়ে মাটিতে ফেলে ডান হাঁটু মুড়ে সোজা রেখে বানানো পিনডির একটি পিনডি বাম হাতে তুলে মৃত্যের উদ্দেশ্যে ডান দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে উল্টো হাতে ধরম ঠাকুরের আসনে ফেলে। অনুরূপ নিয়মে এবং কৌশলে দ্বিতীয় পিনডিটি মৃত্যের পিতৃকুলের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ধরম ঠাকুরের আসনে ফেলা হয়। তারপর তৃতীয় পিনডিটি মৃত্যের মাতৃকুলের পর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে ধরমঠাকুরের আসনে ফেলা হয়। অনুরূপ নিয়মে, কৌশলে, উদ্দেশ্যে বাম দিকের আসনে অর্থাৎ বুড়হাবাবা-মাঁহামাঁই এর আসনে তিনটি পিনডি ফেলা হয়। সব শেষে ডান দিকের আসনে অর্থাৎ গরাম ঠাকুরের আসনে তিনটি পিনডি ফেলা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে উক্ত নিয়মে, কৌশল এবং উদ্দেশ্যে মৃত খাদ্য বস্তুর প্রতি লালসা পোষণ করা সংস্কার মুক্তির নিমিত্ত পিনডি পাড়া সংস্কার পালন করা হয়। এই আধারে কুড়মালি সাংস্কৃতিক গিতে বলা হয়েছে ঃ- তেঁই জে জাবে বেটা ধনি আনবে গঅ। দেই রাখেঁ দুধে কেরি ধারে। দুধেকেরি ধার মাঁই গঅ, সুধালেনি সুধাই গঅ। পিনডি পাড়ি করবঁ উপার। উপার শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। উ-কার অক্ষরটি তন্ত্র ধর্ম মতে সৃষ্টি অর্থ প্রাশের প্রতীক অক্ষর। পার শব্দটির অর্থ অব্যহতি পাওয়া। অতএব সামগ্রিক উপার শব্দটিরট তন্ত্রমতে অর্থ সৃষ্টি থেকে অব্যহতি পাওয়া।

৯) রকত পাড়া ঃ-

পিনডি পাড়া সংস্কারের পরিসমাপ্তির পর তুলসী ঢিপির সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পুকুরে অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তুলসী ঢিপি পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন করা হয়। পরিস্কৃত তুলসী ঢিপির সামনে ভাগ্নের নির্দেশ মতো যে ব্যক্তি পিনডি দান সংস্কার সম্পাদন করেছে

সে পুনঃরায় ধরম ঠাকুর, বুড়হাবাবা-মাঁহাঁমাঁই এবং গরাম ঠাকুর এই তিন ঠাকুরের তিনটি আসন পাতে তিনটি আসনে একই নৈপেদ্য অর্থাৎ বেলপাতা, আতপচাল, দুর্বাঘাস সাজানো হয়। আলাদা আলাদাভাবে তিন ঠাকুরের আরাধনা উপাসনা করা হয়। তারপর প্রাক্‌যৌবন প্রাপ্ত বয়সের কালো রঙের একটি মেদি ছাগল যেটিকে বলি দেওয়া হয় সেটি শুদ্ধিকরণের জন্য মাথাতে জলের হাল্কা ছিটা দেওয়া হয় সিঁদুরের তিনটি টীকা দেওয়া হয়। ছাগলটিকে বলি দেওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে পুনঃরায় তিন ঠাকুরের উপাসনা করা হয়। তারপর প্রথম ধরম ঠাকুরের আসনে সাজানো নৈবেদ্যের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। ছাগলটি স্বেচ্ছায় সাজানো নৈবেদ্য ভক্ষণ করে। অনুরূপভাবে বাকি দুটি ঠাকুরের আসনে সাজানো নৈবেদ্যের সামনেও নিয়ে যাওয়া হয়। ছাগলটি স্বেচ্ছায় সাজানো নৈবেদ্য ভক্ষণ করে। তারপর ছাগলটি যুবকাষ্ঠে চড়িয়ে বলি দেওয়া হয়। বলি দেওয়ার ফলে যে রক্ত ঝরে সেই ঝরা রক্ত তিন ঠাকুরের আসনে দেওয়া হয়। ভাগ্নে অথবা স্বগোষ্ঠী ভক্ত সদস্য ব্যতীরেকে অপর কাহারো বলি দেওয়া নিষেধ। রকত পাড়া ছাগলের মাংস গোষ্ঠীভুক্ত সদস্য ব্যতীরেকে অপর কাহারো খাওয়া নিষেধ। রকত পাড়া ছাগলের কলেজা রান্না করা হয়। যত্ন সহকারে সরক্ষণ করা হয় কারণ ছাঁহেইর ঝিকা অর্থাৎ ছায়া ঢোকানো সংস্কারে নৈবেদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

বর্তমান যুগে এক শ্রেণীর মানুষ জীব হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখী। এ হেন অবস্থাতে কুড়মালি সংস্কৃতির রকত পাড়া সংস্কার নিজেই বলির পাঁঠাতে পরিণত হওয়া উচিত কিনা তা বিচার্য্য বিষয়। মনুষ্য সমাজে বহু মতাদর্শের বহু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস। সকলেই মৃত্যের অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া করে, পারলৌকিক ক্রিয়া করে। অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া করা পারলৌকিক ক্রিয়া করা বিষয়ে সকলের বিশ্বাস এবং কামনা মৃত যেন মোক্ষ লাভ করে কিন্তু মোক্ষ লাভ করার পথ মৃত্যের ফেলে যাওয়া কর্মময় জীবনের কর্ম সংস্কার মুক্ত হওয়া পিন্ডদান প্রথার মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর প্রতি লালসাজনিত সংস্কার মুক্ত করা হয়। এর বাইরে মৃত্যের কর্মময় জীবনে কর্মক্ষেত্রে অথবা স্বভাবশত বহু সংস্কার রক্তের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। সেই সমস্ত সংস্কার মুক্তির জন্য তন্ত্র সাধনা মতাদর্শে গঠিত সকল সংস্কৃতির প্রাচীনতম সংস্কৃতির রকত পাড়া সংস্কারে মধ্যে নিহিত থাকা বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করার বিনম্র অনুরোধ জানাই। ১) প্রাক্‌যৌবন প্রাপ্ত বয়স ঃ উর্বরতা গুণ সৃষ্টি না হওয়া। ২) মেদি উর্বরতার প্রতীক। ৩) কালো রং অন্ধকার অর্থাৎ তেজসক্রিয়তার অভাবের প্রতীক। ৪) রক্তঃ রজঃ গুণের অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতীক। বলি দেওয়ার অর্থ হত্যা করা অর্থাৎ জীবন্ত থাকার সমস্ত গুণ নষ্ট করা। কুড়মালি সংস্কৃতির রকত পাড়া সংস্কারে উর্বরতা গুণ সৃষ্টির পূর্বে তাকে নষ্ট করা, সৃষ্টির উৎস তেজসক্রিয়তা গুণ নষ্ট করা, সৃষ্টি ও গুণধারক রজঃগুণ নষ্ট করার প্রতীক স্বরূপ ছাগল বলি প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমান পাওয়া যায়। রকত পাড়া সংস্কারের মাধ্যমে কুড়মি জাতি মৃতের কর্মময় জীবনের রক্তের সাথে মিশে থাকা কর্ম সংস্কার মুক্ত করে এবং মোক্ষ লাভ প্রাপ্তির পথ পরিস্কার করে। কুড়মি জাতি কেবলমাত্র রকত পাড়া সংস্কারেই জীব হত্যা করে এরূপ চিন্তন সঠিক নয়। তাদের জীবিকা নির্বাহ করার একমাত্র পেশা কৃষিকর্মে। কৃষি করার

পথে ও জ্ঞাতসারে মাটিতে এবং জলে বসবাসকারী বহু জীবকে হত্যা করে। জীব হত্যা করা কুড়মি জাতির একমাত্র পেশা কৃষিকর্মের সাথে সংযুক্ত আছে।

কৃষক কুড়মি জাতির এ হেন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হরিবোল মহামন্ত্রের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিবোল মহামন্ত্র জপনা করার যে পথ নির্দ্দেশনা তেল-মৎস-নারী তিন ত্যজি ভজহরি কুড়মি অধ্যুষিত এলাকা কুড়মাচলের কৃষিকর্ম পেশাধারী মানুষজনের জন্য যে পথ পরিবর্তন করে বলে গেছেন তেল-মৎস-নারী তিন নিয়ে ভজহরি। জীবহত্যা করা ব্যতীরেখে কৃষিকর্ম সম্ভব নয়। তাই কৃষিজীবি কুড়মির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে জীব হত্যা করা অন্যায় বা অপরাধের বিবেচনা করা সঠিক নয়।

১০) ছাঁহেঁইর ঝিঁকা (ছায়া ঢোকানো) ঃ-

কুড়মালি সংস্কৃতিতে পারলৌকিক অর্থাৎ কামানের শেষ সংস্কার ছাঁহেঁইর ঝিঁকা সংস্কার। পঞ্চভূতের দেহ মৃত্যুর পর পঞ্চভূত বিলিন হয়ে যায়। কিন্তু বিদেহী অর্থাৎ জীবাত্মা, তার তো বিনাস ঘটে না। সে তো অবিনাসী। জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলে যায়। কুড়মি জাতির বিশ্বাস পরমাত্মার সাথে মিলে যাওয়া জীবাত্মার ছায়া অবশ্যই থাকবে। জীবাত্মার অবশ্যই থাকা ছায়াকে ঘরের গোপন কুঠরীর মধ্যে ঢুকিয়ে প্রতিষ্ঠা করাকেই ছাঁহেঁইর ঝিঁকা সংস্কার বলা হয়।

ছাঁহেঁইর ঝিঁকা সংস্কারে নিয়ম এবং পদ্ধতি ঃ আহুত, বরাহুত, সমবেত সকল শ্রেণীর মানুষ জনকে কামান খাওয়া ভোজ খাওয়ানোর জন্য রান্না করা ভাত ব্যবহার করার পূর্বে পিঁড়ি পাড়ইআ অর্থাৎ পিন্ড দানকারী শুদ্ধচিত্তে তিনটি শাল পাতাতে তিন মুঠা ভাত নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে শুদ্ধস্থানে সংরক্ষণ করে। এই ভাতকে আগভাত বলা হয়। আহুত, বরাহুত, সমবেত সকল শ্রেণীর মানুষজনকে কামান খাওয়া ভোজ খাওয়ানোর পর অর্থাৎ খাওয়ানো-ধোয়নো এবং খাওয়া-ধোয়ার পাঠ চুকিয়ে তুলসী ঢিপিকে ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করার পর গোবর জল দিয়ে শুদ্ধ করা হয়। পিঁড়ি পাড়ইআর মানে পিন্ড দানকারী স্ত্রী অভাবে বোন শুদ্ধচিত্তে ঘরের ভিতরে হয় নাউআঁ চুলহাঁইমানে নতুন উনানে না হয় শুদ্ধকৃত উনানে নাউআঁ কারাহিঁই (রান্না করার মাটির নতুন পাত্রে) তেল, লবন, মশলা বর্জিতভাবে রকত পাড়া ছাগলের সংরক্ষিত কলেজাটি ভাজে। পিন্ডদানকারী শুদ্ধচিত্তে ঘরের ভিতর থেকে নউআঁ টঁকিই (বাঁশের বোনা এক প্রকার পাত্র) ঘিয়ের প্রজ্বলিত প্রদীপ স্থাপন করে মাথাতে বহন করে তুলসী ঢিপির সম্মুখে রাখে। যে কলেজা ভোজেছে সে নাঁউআঁ সুপে অর্থাৎ নুতন কুলাতে করে সংরক্ষিত আগভাত এবং কলেজা ভাজা মাথাতে বহন করে তুলসী ঢিপির সম্মুখে রাখে। পিন্ডদানকারী হরিবল শব্দব্রহ্ম স্মরণ পূর্বক প্রথমে ধরম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে আগভাত এবং কলেজা ভাতা তুলসী ঢিপির সম্মুখে সমর্পন করে। তারপর বুড়হাবাবা-মাঁহামাঁই এর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে। তারপর গরামঠাকুরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে। সর্বশেষে ঘিয়ের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপখানি টঁকিক ভিতরে ঢুকিয়ে মাথাতে বহন করে পিছনে হেঁটে ঘরের

গোপন কুঠরীর মধ্যে প্রদীপকটি টাঁকি থেকে নামিয়ে রেখে দেয় । হরিবল শব্দ ব্রহ্ম স্মরণপূর্ব্বক মৃত্যের জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিশে যাওয়ার অর্থাৎ মোক্ষ লাভ প্রাপ্তির প্রার্থনা করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে।

ধরম পূজা—

ব্রহ্ম চিরনিশ্চল। চিরনিশ্চল ব্রহ্মের এক শতাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হলো এবং সেই চঞ্চলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এই ব্রহ্মান্ড এই জগতের সৃষ্টি হলো। ঐ এক শতাংশ পঞ্চতত্বের মধ্য দিয়ে এক লম্ব তরঙ্গ বিশিষ্ট হয়ে সৃষ্টির রচনা হলো, জীব বেঁচে থাকলো। এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রহ্মের যে এক শতাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হলো সেই এক শতাংশ জীবের সৃষ্টি। অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ।

পঞ্চতত্বে অর্থাৎ পঞ্চভূতে জীবের সৃষ্টি। পুরুষের অর্থাৎ নরের ক্ষিতি, অপ এবং তেজের অর্থাৎ তাপের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ নরের আড়াই অংশ এবং প্রকৃতির অর্থাৎ নারীর মরুৎ, ব্যোম এবং তেজের অর্থাৎ তাপের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ নারীর আড়াই অংশ। এই দুই আড়াই অংশ ক্রিয়াশীল অবস্থাতে ব্রহ্মযোনিতে মিলনে জীবের সৃষ্টি। ক্ষিতি এবং অপ পুরুষ অংশীয়া। মরুৎ এবং ব্যোম প্রকৃতি অংশীয়। কিন্তু তেজ উভয় অংশীয়া তাই এককভাবে পুরুষ সৃষ্টি করতে পারে না। তদ্রুপ প্রকৃতি ও একক ভাবে সৃষ্টি করতে পারে না। যেহেতু তেজ উভয় অংশীয় তাই জীব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং জীব জীবন্ত থাকার ক্ষেত্রে তেজ অর্থাৎ তাপ প্রধান। তেজ অর্থাৎ তাপ ব্যতীরেকে জীব সৃষ্টিও হতে পারে না, জীবন্তও থাকতে পারে না। কুড়মি জাতির বিশ্বাস তাপ প্রদান করেন সূয্যদেব অর্থাৎ কুড়মির ধরম ঠাকুর। ধরম শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। ধরম শব্দে ব্যবহৃত ধকার অক্ষরটি ধর ধাতুর ধারন করা শব্দের প্রতীক অক্ষর। র কার অক্ষরটি তেজ অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। ম কার অক্ষরটি ব্রহ্ম বা বিন্দু অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। সর্বসংযুক্তিতে গঠিত ধরম শব্দের অর্থ তেজ এবং ব্রহ্মকে ধারণ করা। তেজ এবং ব্রহ্ম বা বিন্দুকে ধারণ করে রাখাই ধরম। তেজ এবং বিন্দুর স্রষ্টা যিনি তিনিই ধরম ঠাকুর। এই বিশ্বাসে কুড়মি জাতি নিজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সন্তান-সন্ততির পরমায়ু দীর্ঘায়িত করার কামনাতে তাপ এবং ব্রহ্ম প্রদানকারী ধরম ঠাকুরের আরাধনা, উপাসনা এবং পূজা করাকে ধর্মীয় কর্ত্তব্য রূপে পালন করে। ধরম ঠাকুরের এই পূজাকেই কুড়মি জাতি ধরম পূজা বলে।

ধরম পূজা করার নিয়ম সংস্কার ও বাধা নিষেধ (নেগ চার আর ঝর বিচ) ঃ-

সূর্যদেব উত্তরায়ণের থাকাকালে ধরম পূজা করার প্রশস্ত সময়। তন্মধ্যে দুটি মাসে ধরম পূজা করা নিষেধ। ঐ দুটি মাস হলো ১) চৈত্র এবং ২) আষাঢ়। সূর্য্যদেব দক্ষিণায়নে থাকাকালে মাত্র দুটি মাসে ধরম পূজা বিধি সম্মত। যেমনঃ- কার্ত্তিক এবং ২) অগ্রহায়ণ মাসে ধরম পূজা করা বিধি সম্মত। কিন্তু শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এবং পৌষ ধরম পূজা নিষেধ। যুগ যুগ

ব্যাপি কুড়মি সমাজের ধরম পূজা করার দিন নির্ধারিত হয়ে আছে। যেমন ঃ- মাসের সংক্রান্তিতে না হয় ঐ মাসের চাঁদের পূর্ণিমার দিন। পুজার পূর্ব দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্ব দিন এবং পূর্ণিমার পূর্ব দিন অধিবাস কুড়মালি ভাষাতে বার পালন করে। কিন্তু সূর্যাস্তের পর শুদ্ধচিত্তের নিরন্ন ভোজন করে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে শুদ্ধ হওয়ার উপায় নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটানো, দাড়ি কামানো এবং অতি অবশ্যই নখ কাটানোর পর স্নান করা। নখ কাটানো প্রধান। সন্তান-সন্ততির বিবাহের পূর্বে ধরম পূজা সংস্কার সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিশেষ কারণবশত তা যদি সম্ভব না হয়ে উঠে তাহলে ধরম ঠাকুরের মানত করে ঘরের মুধইন খুঁটিতে কুলা (সুপ) ঝুলিয়ে দিয়ে বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করা বিধি সম্মত। অধিবাস অথবা বারের রাত্রিতে সমাগত সকলের রাতের ভোজন সমাপনান্তে তুলসী টিপি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে বুড়হাবাবার দেওয়া আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত সপ্ত খন্ড মাঁহাঁরাই গিত গিতাকারে গাহা হয়। গোষ্ঠীর মধ্যে যদি কেহ গর্ভধারণ করে থাকে তাহলে সর্ব্বোতভাবে ধরম পূজা করা নিষেধ। উষা কালে পূজা শুরু করে সূর্যোদয় মুর্হূতের মধ্যে পূজা সম্পন্ন করা বিধেয়।

সুরুজ পূজা—

সুরুজ শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষাতে যার প্রতিশব্দ সূর্য্য। স কার+উকার + র কার +উকার +জ কার অক্ষরগুলির সংযুক্তিতে সুরুজ শব্দটি গঠিত হয়েছে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক বহু শব্দে তন্ত্র সাধনাতে ব্যবহৃত বহু প্রতীক অক্ষর ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। সুরুজ শব্দে ব্যবহৃত সকার অক্ষরটি স্ত্রী অর্থাৎ প্রকৃতি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। উকার অক্ষরটি সৃষ্টি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। এতৎসূত্রে সকারের সাথে উকারের সংযুক্তিতে সৃষ্ট সু শব্দের অর্থ প্রকৃতির সৃষ্টি। অনুরূপভাবে 'র' কার অক্ষরটি তেজ অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। উ কার অক্ষরটি সৃষ্টি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। র কারের সাথে উ কারের সংযুক্তিতে সৃষ্ট রু শব্দের অর্থ তেজের সৃষ্টি। জ কার অক্ষরটির অর্থ উপায়। প্রকৃতি এবং তেজ সৃষ্টির উপায়কে সুরুজ বলা হয়েছে। যে বল তেজ এবং প্রকৃতির স্রষ্টা সেই বলকে সুরুজ বলা হয়েছে। জীব সৃষ্টির আধার শক্তি প্রকৃতি। জীব সৃষ্টির এবং জীবকে জীবন্ত রাখার উৎস তেজ। প্রকৃতি এবং তেজের স্রষ্টা এককভাবে সুরুজ তাই কুড়মি জাতি কেবলমাত্র সুরুজকে ভগবান বলে। এতদ্বব্যতীরেকে সমস্ত দেব-দেবীকে (সিন-সিনিকে) ঠাকুর বলে। ভগ এবং বান শব্দ দ্বয়ের সংযক্তিতে ভগবান শব্দটি গঠিত। ভগ শব্দের অর্থ যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি। বান শব্দের অর্থ পুরুষাঙ্গ অর্থাৎ তেজ। সুরুজ এককভাবে একাধারে বান একাধারে ভগ। তাই সুরুজ ভগবান। কুড়মি জাতি এই সুরুজ ভগবানের পুজাকে সুরুজ পূজা বলে। আমার মনে হয় কুড়মালি সংস্কৃতির চিন্তন এবং মননশীললতাতে সৃষ্ট সুরুজ শব্দের সমার্থক সূর্য্য শব্দ নয়। তাই সুরুজ পুজাকে সূর্য্য পুজা নামে অভিহিত করা সমীচীন নয়।

গুষ্টিধারী (গোষ্ঠী), গুষ্টি নামে পরিচিত কুড়মি জাতি গুষ্টির অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যকে প্রাকৃতিক সকল প্রকার বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত রাখার কামনার্থে, এবং জীব সৃষ্টির উৎস, জীবকে জীবন্ত রাখার উৎস তেজকে গুষ্টি বৃদ্ধির, গুষ্টির সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়িত করার কামনার্থে গুষ্টিগতভাবে সুরুজ পুজা করে।

সুরুজ পুজার স্থান নিয়ম নীতি ঃ- সুরুজ পূজাতে গুষ্টির সকল সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাই প্রশস্ত মাঠের মধ্যে দাগ কেটে আখড়া বাঁধা হয় অর্থাৎ আসর প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেহেতু আখড়ার মধ্যে পূজার কর্মসূচী পালন করা হয় তাই এই পূজাকে আখড়া পূজাও বলা হয়। একগুষ্টির গুষ্টিগত অর্থাৎ এক পাঁতার অর্থাৎ এক পঙক্তির পুজা তাই এই পূজাকে পাঁতা পুজা ও বলা হয়। সুরুজ ভগবানের পুজা তাই এই পুজাকে সুরুজাহি পুজা ও বলা হয়।

একের একাধিক নাম হওয়ার কারণ কুড়মি সমাজের নারী সমাজ পিতা-মাতা, শশুর-শাশুড়ী, ভাঁসুর-মামা শশুর, পিসা শ্বশুর , মেসো শ্বশুর ইত্যাদি গুরুস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নাম উচ্চারণ করা অপরাধ বোধ করে। তাই উক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম যে সকল অনুষ্ঠান, উৎসবের নামের সাথে মিলে যায় সেক্ষেত্রে সেই অনুষ্ঠান, উৎসবের বিধি-বিধান, ক্রিয়া-করণ অনুসারে নামের সার্থকতা বজায় রেখে নতুন নামে নামকরণ করে।

সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে থাকাকালে মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে এবং দক্ষিণায়নে থাকাকালে কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসে সুরুজ পুজা করা বিধি সম্মত। উক্ত মাসগুলির মধ্যে যে মাসে পূজা করার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে সেই মাসের চাঁদের পূর্ণিমা অথবা সেই মাসের সংক্রান্তি অথবা যে কোন রবিবারে সুরুজ পুজার পূর্বদিন অর্থাৎ শনিবারে বার পালন করতে হয়।

গরাম পূজা—

কৃষিকর্ম উদ্ভাবক, কৃষিজীবি কৃষক কুড়মি জাতি প্রতি বৎসর সূর্য্যদেব উত্তারয়ণে থাকাকালে অর্থাৎ মাস মাসের প্রথম দিবস থেকে শুরু করে আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দিবসের মধ্যে গরাম পূজা সম্পন্ন করে থাকে। গরাম শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। আমার মনে হয় এই শব্দটির বাংলা ভাষাতেপ্রতিশব্দ হয় না। গরাম শব্দে ব্যবহৃত গ কার রকা আ (া) কার ম কার অক্ষরগুলি তন্ত্র সাধনাতেও ব্যবহৃত প্রতীক অক্ষর। গ কার অক্ষরটি বাপগ, মাঁইগ অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। বাপগ মানে আদিবাপ অর্থাৎ বুড়হাবাবা, আদিমাঁই মানে মাঁহামাঁই অর্থাৎ পরকিতিমাঁই অর্থাৎ প্রকৃতি মাতা অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। র কার অক্ষরটি তেজ অর্থাৎ তেজের অধিষ্ঠাতা দেবতা ধরম ঠাকুর অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। আ কার (া) অক্ষরটি বায়ু অর্থাৎ বাকভূত বাঘুৎ অর্থাৎ বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। ম কার অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ জল অর্থাৎ জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা বানসিন ঠাকুর অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন পরিমান মাফিক তেজ, বায়ু এবং জল ব্যতীরেকে

কৃষিকর্ম করা অসম্ভব। তাই কৃষক কুড়মি জাতি প্রতিবৎসর গরাম থানে অথবা উক্ত থানের চৌহদ্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পাঁচ থানে বুড়হাবাবা, মাঁহাঁমাঁই, ধরম ঠাকুর, বাঘুৎঠাকুর এবং বানসিন ঠাকুরে পুজা করে। এই পঞ্চ ঠাকুরের পুজাকে গরাম পুজা বলা হয়। এতৎ কারণে গরাম শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ হয় না। শুধু তাই নয় গরাম শব্দের কুড়মালি ভাষাতে ও গাঁউ হতে পারে না। কারণ গরাম শব্দে পাঁচ অধিষ্ঠাতা ঠাকুরের সমন্বয় অর্থ প্রকাশ করে এবং গাঁউএর মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক। কুড়মালি সংস্কৃতির বিজ্ঞান যথাযত অনুধাবন করতে না পারার কারণে বর্তমানে অনেকেই গরাম পুজাকে গ্রামপুজা বলে থাকেন। এটা কিন্তু অত্যন্ত অপরাধের কারণ এর দ্বারা ভারতবর্ষের প্রাচীনত কৃষিকর্ম আধারিত কুড়মালি সংস্কৃতি বিজ্ঞান ধ্বংস হবে এবং কুড়মালি সংস্কৃতিকে অপ সংস্কৃতির ঘনঘোর অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। কৃষিজীবি কুড়মি জাতি প্রতি বৎসর সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে গমনারম্ভকালে অর্থাৎ ১লা মাঘ আখাইন-জাত-রা দিন হার পুনহাঁ (লাঙ্গলচালানো) সংস্কার পালনের মাধ্যমে সামগ্রিক কৃষিকর্মের সূচনা করে। কৃষিকর্মে সামগ্রিক সাফল্য লাভের কামনার্থে পুরুষ-প্রকৃতির অর্থাৎ বুড়হাবাবা-মাঁহাঁমাঁই এর মিলন অর্থাৎ সৃষ্টির সূত্রে সংযোগ কামনার্থে এবং সৃষ্টির উৎস এবং সৃষ্টকে জীবন্ত রাখার তিন অধিষ্ঠাতা ঠাকুর যথা তেজের অধিষ্ঠাতা ঠাকুর ধরম ঠাকুর বায়ুর অধিষ্ঠাতা ঠাকুর বাঘুৎ ঠাকুর জলের অধিষ্ঠাতা ঠাকুর বানসিন ঠাকুর এই পঞ্চ ঠাকুরের পূজা একদিনে একই সময়কালে মধ্যে গরাম থানে একত্রিত ভাবে অথবা গরাম থানের চৌহদ্দির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্পন্ন করে গরাম পুজা সংস্কার পালন করে।

— তন্ত্রধর্ম ও তার ভাষা—

কুড়মি জাতির জীবিকা নির্বাহের পেশা (জিনগানি পুহাউঅন বিরিত) চাস কাম অর্থাৎ কৃষিকর্ম এবং জীবন নির্বাহের পথ (জিউ পুহাউঅন ডহর) তনতঁত সাধন অর্থাৎ তন্ত্র সাধনা। এতৎকারণে কৃষিকর্ম এবং তন্ত্র সাধনা আধারে কুড়মি জাতির মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষাতে গড়ে উঠেছে কুড়মালি সংস্কৃতি। বংলা ভাষার তন্ত্র শব্দটি কুড়মালি ভাষার তনতঁত শব্দ থেকে সৃষ্ট। প্রমান সাপেক্ষে উল্লেখ করা যায় বহু পন্ডিত এবং গবেষকগণের অভিমত তন্ত্র ধর্ম প্রকাশের ভাষা দ্রাবিড় ভাষাতে কথ্যরূপে পাওয়া যায়। তাতেই মনে হয় তন্ত্র ধর্ম দ্রাবিড়ীয় দ্বারা উদ্ভুত, প্রতিষ্ঠিত। শিব অর্থাৎ কুড়মির বুড়হাবাবা ও শক্তির অর্থাৎ কুড়মির মাঁহামাঁই এই দুয়ের উপাসনা নিয়েই উদ্ভুত হয়েছিল তনতঁত ধরম অর্থাৎ তন্ত্রধর্ম। তনতঁত ধরম মন্ত্র মূলক নয় ক্রিয়া মূলক। কুড়মালি ভাষার তন শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ শরীর এবং তঁত শদটির প্রতিশব্দ সন্ধান। সামগ্রিক তনতঁত শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ শরীর সন্ধান। যার ভাবার্থ শরীর সৃষ্টি হওয়ার পুর্ব্বাবস্থা থেকে শুরু করে শরীর বিনাশ প্রাপ্তির পর মোক্ষলাভ প্রাপ্তির পথের সন্ধান দেওয়াকে তনতঁত বলা হয়।

কুড়মি জাতি কৃষিজীবি। কৃষিকর্ম করার অর্থ শস্যদানাকে অঙ্কুরিত করা থেকে শুরু করে পুনঃরায় শস্য দানা ফলানো, পাকানো। সমস্ত প্রক্রিয়াটা সৃষ্টি বিষয়ক প্রক্রিয়া। সকল

জীবের সৃষ্টির পথ এক এবং অভিন্ন ভাবনাতে ভাবিত হয়ে কৃষি কর্মে সাফল্য লাভের কামনাতে কুড়মি জাতি নিজ শরীর সৃষ্টি সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্বের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করে, নিজ শরীরকে প্রয়োগশালাতে পরিণত করার ফলে উপলব্ধি করে সৃষ্টির মূলে রয়েছে পুরুষ অর্থাৎ আদি পুরুষ অর্থাৎ বুড়হাবাবা ও প্রকৃতিমাতা অর্থাৎ মাঁহামাই। তাই তারা পুরুষ ও প্রকৃতির উপাসনা শুরু করে, উপাসকে পরিণত হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির উপাসনার হাত ধরেই তনতঁত ধরম অর্থাৎ তন্ত্রধর্মের উদ্ভব।

ভাষার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদগণ ধোঁয়াশা রেখে গেছেন। স্পষ্টীকরণ করেননি। তাঁরা বলেছেন তন্ত্র ধর্ম প্রকাশের ভাষা দ্রাবীড় ভাষা। দ্রাবীড় একটি রাজ্য। রাজ্যে বহু ভাষা প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। তন্মধ্যে যে ভাষাটি উক্ত রাজ্যের রাজ্য ভাষা নিশ্চয় সেই ভাষাটিকে দ্রাবীড় ভাষা বলাটাই স্বাভাবিক। দ্রাবীড় রাজ্যের তন্ত্র ধর্ম প্রচলিত থাকাকালে উক্ত রাজ্যের যে ভাষাটি রাজ্য ভাষা ছিল নিশ্চয় সেই ভাষাটিকে তন্ত্র ধর্ম প্রকাশের ভাষা অর্থাৎ দ্রাবীড় ভাষা বলা হয়েছে।

তন্ত্র ধর্ম উদ্ভবের মূলে রয়েছে কৃষিকর্ম। কারণ কৃষিকর্মে পুরুষ ও প্রকৃতির আরাধনা উপাসনা আবশ্যিকর্ম। পুরুষ ও প্রকৃতির আরাধনা উপাসনার হাত ধরেই তন্ত্র ধর্মের উদ্বব। এক কথায় বলা যায় যে জনগোষ্ঠীর মানুষ কৃষিকর্মের উদ্ভাবক তারাই তন্ত্র ধর্মের ও উদ্ভাবক এবং প্রবর্তক। তাদের মাতৃভাষাই তন্ত্র ধর্ম প্রকাশের ভাষা। তাদের মাতৃভাষাকেই দ্রাবীড় রাজ্যের রাজ্য ভাষা বলা হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে কোন ভাষাকে দ্রাবীড় ভাষা বলা হয়েছে তার প্রমাণ তখনই পাওয়া সম্ভ যখন কৃষি উদ্ভাবক জনগোষ্ঠী মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে। বিষয়টি অত্যন্ত সমস্যা জড়িত কারণ কেবল মাত্র প্রত্নতাত্বিক গবেষনা দ্বারা প্রাপ্ত প্রমানাদি দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় আনুমানিক দশ থেকে পনের হাজার বৎসর পূর্বে দ্রাবিড় রাজ্যে কৃষিভিত্তিক উন্নতমানের একটি সুসভ্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যে সভ্যতাটি সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। উক্ত সভ্যতা গড়ে উঠা কালে ছাপাখানাতেও ছাপানো কোন ও পুথি পত্রাদি প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং মৃৎপাত্রে শীলমোহর, লতা-বক্ষ, কোনো দেবতার ইঙ্গিতবাহী তিন শিরওয়ালা চিত্র এবং কিছু শিলালিপি পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় অদ্যাবধি উক্ত শিলালিপিগুলি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এতৎকারণে উক্ত বিষয় বিষয়ে লিখিত প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থাতে প্রমান পাওয়ার বিকল্প পথ ১) কৃষিকর্ম করার উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করার স্বভাব এবং মানসিকতা যে জনগোষ্ঠীর মানুষ পোষন করে তাদের অনুসন্ধান করা। ২) কৃষিকর্ম করার উপকরণ সমুহের নামের ভাষা কোন জনগোষ্ঠী মানুষের মাতৃভাষা তার অনুসন্ধান করা ৩) অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলির নামের ভাষা এবং কোন পেশাগত কর্মের আধারে অনুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে তার অনুসন্ধান করা। ৪) সিন্ধু সভ্যতার শিল্পকলার ধারক এবং বাহক জনগোষ্ঠী মানুষের অনুসন্ধান করা। স্মরণ রাখতে হবে আর্য্যাগমনের পূর্বে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠাকালে এমন কি বর্তমানকালেও ও অনার্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের উদর

পুরনের প্রধান এবং সর্বোৎকৃষ্ঠ কৃষিজ শস্য দানা চাল যা ধান থেকে পাওয়া যায়। তাই কৃষি কর্ম করার অর্থ ধানের ফসল ফলানো কেন্দ্রীক কর্ম। ধানের ফসল ফলানোর সাথে বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, ডাল, ফুল, ফল, কাঁদা ইত্যাদি নানা প্রকার ফসল ফলানোর উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। মালভূমি অঞ্চলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এই তিনের প্রভাব যা উক্ত ফসলাদি ফলানোর ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তা প্রায় প্রায় সমপরিমান পাওয়া যায়। মালভূমি অঞ্চলের মাটি উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো। ফলত সহজে কৃষি জমি তৈরী করা সম্ভব এবং প্রয়োজন বোধে শস্য খেতকে শুকনো করা এবং জলভরা সহজ। কৃষি সহায়ক পশুর প্রশস্ত চারণ ভূমি মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন প্রকারের যেমন ডাড়ি, চুআ ঝার্না, গাড়হা, ডভা, দ, হদ, জলাশয় এবং জলস্রোতগুলি কৃষিজ শস্য গাছ সিঞ্চনে নির্বিঘ্নে ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যায়।

অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া যায় মালভূমি অঞ্চলে বসবাস করা কুড়মি জাতির স্বভাব এবং কৃষি কর্ম করা তাদের মানসিকতা। অনুসন্ধানের উৎস কুড়মি জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে, করম পরবে, বাঁদনা পরবে ইত্যাদিতে শ্রুতিরূপে আবহমান কাল থেকে গেয়ে আসা কুড়মালি ভাষার বিহাগিত, করমগিত, বাঁদনাগিত ইত্যাদি গিত, কাহিনী, হেঁআলি, প্রবাদ্য বাক্য। উক্ত শ্রুতিগুলিতে প্রমাণ পাওয়া যায় কুড়মি জাতি জাম-বু-দীপের অর্থাৎ ভারতবর্ষের মেহরগড় আদিকালে কুড়মি জাতির কুড়মালি ভাষাতে নামকরণ করা মেহালগড় অঞ্চলে বসবাস করাকালে কৃষিকর্মের দ্বারা ধান শস্য দানার ফসল ফলানোর সূচনা করেছিল। উক্ত মেহালগড় বা মেহরগড় অঞ্চলটি মালভূমি। স্থানাভাবে কুড়মি জাতি সেখান থেকে স্থানান্তর করে সিন্ধু নদীর উপত্যকাতে স্থানান্তরন করে সে অঞ্চলটিও মালভূমি অঞ্চল। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কারণে, প্রতিবেশী শত্রুর ক্রমবর্দ্ধমান শত্রুতার কারণে স্থানান্তরনে বাধ্য হয়ে রাজস্থান, গুজরাত, বুন্দেল খন্ড, বাঘেল খন্ড অর্থাৎ বর্তমানের বাসভূমি ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের জলস্রোত কিনারে ছিল।

হালফিল কতিপয় গবেষকের অভিমত কুড়মি জাতি স্থানান্তরন করে ছোটনাগপুর মালভূমিতে আগমন করেনি। এরা এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র সুদুর অতীতে এদেরই কৃষিকর্ম পেশাগতে এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা যার পরিচয় ছিল সবরনাখা সুঘড়ামু অর্থাৎ সুবর্ণরেখা সভ্যতা। যাই হোক বিষয়টি সঠিক হলে ও প্রমাণিত সত্য কুড়মি জাতির স্বভাব মালভূমি অঞ্চলে বসবাস করা যেহেতু কড়মি জাতির মানসিকতা কৃষিকর্ম করা এবং জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পেশা কৃষিকর্ম এবং কৃষি কর্মে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনে এবং সময় মতো শস্য গাছে পরিমিত জল সিঞ্চন। এতৎ কারণে মালভূমি অঞ্চলের যে সব এলাকাতে জলস্রোত এবং প্রাকৃত জলাশয়ের প্রাচুর্য্যতা থাকে কুড়মি জাতি সেই সব এলাকাতে বসবাস করে। তাই তো কুড়মালি প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে জেঁদে জেঁদে পানিক সত (সৎ) তেঁদে কুড়মিক বসাগইত।। প্রবাদ বাক্যটির বাংলা ভাষাতে ভাষান্তর যে দিকে যে দিকে জলস্রোত সেই দিকে সেই দিকে কুড়মির বসবাস। এই প্রেক্ষিতে আরো বলা হয়েছে উঁড়

কুড়মি একাসি সালুক নাড়হাক বেসাতি। ঢঁড়সাপ এক প্রকার সাপ। যে সাপ জলাশয় অথবা জলস্রোত কিনারে বাস করে এবং জলজজীব আহার করে। কুড়মি জাতি কুড়মালি ভাষাতে এক কথায় সেই সাপকে ঢ়ঁড় বলে। ঢ়ঁড় কুড়মি একাসি বাক্যটির ভাবার্থ- একাসি গুসটিধারী কুড়মি জাতি ঢ়ঁড় অর্থাৎ ঢ়ঁড় সাপ সদৃশ্য জলস্রোত কিনারে বসবাস করে এবং জল সিঞ্চনে উৎপাদিত শস্য দানা আহার করে ঢঁড়হা অর্থাৎ পেট বা উদর পূরণ করে। বাক্যটির দ্বিতীয়াংশের অর্থাৎ সালুক নাড়হাক বেসাতি অংশের ব্যাখ্যা-সালুক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের কাঁদা (কন্দ)। সেই কাঁদা থেকে অঙ্কুরিত ডাঁটাকে কুড়মালি ভাষাতে সালুক নাড়হা বলা হয়। এই নাড়হা অর্থাৎ ডাঁটাটি জলে নিমজ্জিত থাকে। নাড়হাটির অর্থাৎ ডাঁটাটির অগ্রভাগে অর্থাৎ জলের উপরে প্রস্ফুটিত ফুলকে শালুক ফুল বলা হয়। ফুল এবং কাঁদা বাদ দিয়ে জলে নিমজ্জিত থাকা নাড়হা অর্থাৎ ডাঁটা অংশটির সাথে কুড়মি জাতি বেসাতি। বেসাতি শব্দের অর্থ কারবার। জল স্ফীতির সাথে সাথে সালুক নাড়হা যেভাবে বেড়ে উঠে এবং ফুলকে রক্ষা করে তদ্রুপ কুড়মি জাতি কৃষিকর্মে আহার্য্য শস্য দানা গাছ উৎপাদন করে এবং নিয়মিত পরিমান মাফিক জল সিঞ্চন দ্বারা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়ে সমাজকে রক্ষা করে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে তর্কাতীতভাবে স্বীকার করা যায় কৃষিকর্ম করার জন্য যে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশে বসবাস করা কুড়মি জাতির সহজাত স্বভাব এবং কৃষিকর্ম করা তাদের মানসিকতা।

দ্বিতীয়ত কষিকর্ম করার উপকরন সমুহের নাম /যথা ঃ-

হার, ফার, পাসি, টড়া, পাঁখা, মুড়, ছিঁড় সাঁইড় বা ইস, পাট, সুবধনি, ছেউ, আউগার, উচকন, খেঁজ, মেইর, মেইরডাঁড়ি, কারহা বা রাস্কা, হাথা সগড়, গাড়ী, পাই, পুঁঠিআ, আরা, অলা, বঁধ, হাইল, উদল, কেউড়লা, পেঁজড়ি, নিঘা ইত্যাদি সকল সরঞ্জামের নামের ভাষা প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকার করা যায় কুড়মি জাতির মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ।

তৃতীয়ত, ছোটনাগপুর মালভূমি ভূখন্ডে এবং তৎসংলগ্ন ভূখন্ডে অর্থাৎ শিখ, শিখর, নাগপুর, আধা আধি খড়গপুর ভূখন্ডে স্বীকৃত অস্বীকৃত জনজাতি মানুষের বসবাস। তাদের সকলের নিজ নিজ ভাষা এবং সংস্কৃতি আছে। তথাপি এই ভূখন্ডে বহুল প্রচলিত বারো মাসে তেরো পরবগুলি নিয়মে বেনিয়মে অপনিয়মে কম বেশী সকল শ্রেণীর জনজাতি এমনকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও আনন্দ উপভোগ করার জন্য পালন করে। তন্মধ্যে একক কুড়মি জাতি বারো মাসে তেরো পরবগুলি নিয়ম মেনে বিধিসম্মতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জাঁকজমক সহকারে সব পরবগুলি অনিবার্যভাবে পালন করার প্রমাণ বর্তমান আছে। শুধু তাই নয় পরবগুলির নামের ভাষা ও কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের ভাষা। প্রমাণ হেতু পরবগুলির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পরবগুলির নাম যথা ঃ- ১) আখাইন জাত-রা। (আখা ইন জাত-রা) ২) চড়ক

পুজা ৩) রহিন ৪) রাজা সলহা ৫) আঁবাবতি ৬) জাঁতাড় পূজা ৭) করম পরব ৮) জিতিআ পরব ৯) দেঁসেই পরব ১০) জিরহুল পরব ১১) বাঁদনা বা সেঁহরেই পরব ১২) ডিনিমাঁই আনা আর টুসু থাপনা পরব ১৩) মকর পরব। প্রতিটি পরবের সৃষ্টির আধার কৃষিকর্ম। যেমনঃ- আখাইন - জাত-রা এই দিনে কুড়মি জাতি লাঙ্গণ কর্ষণ করার মাধ্যমে সামগ্রিক কৃষিকর্মের সূচনা করে। চড়ক পূজার দিন কুড়মি জাতি সংরক্ষিত বীজের অঙ্কুর উদগমের ক্ষমতা পরীক্ষা করে অর্থাৎ বীজ শোধন করে। রহিন দিনে কুড়মি জাতি আগামী মরশুমে ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ বপন করা শুরু করে। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলন ব্যতীরেকে সৃষ্টি অসম্ভব তাই কুড়মি জাতি বপন করা বীজে অঙ্কুর উদগম হওয়ার কামনাতে রাজাসলহা পরব পালন করে। পুরুষ ও প্রকৃতির সলহা অর্থাৎ মিলনের ফলে বপন করা বীজে অঙ্কুরিত চড়কা অর্থাৎ সাদা রঙের অঙ্কুরগুলির বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সবুজ রঙের চারাগাছে পরিণত হওয়াতে প্রকৃতি মাতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাওয়ার আনন্দে আঁবাবতি পরব পালন করে। সবুজ রঙের চারাগাছগুলিতে চারাতলা থেকে তুলে কৃষি জমিতে রোপন করার জন্য জমি তৈরীর উদ্দেশ্যে লাঙ্গল কর্ষণ করার সূচনা করার পূর্বে কুড়মি জাতি জাঁতাড় পূজা পরব পালন করে। রোপন করা চারাগাছগুলির প্রাক্‌যৌবন বয়স হওয়াকালে কুড়মি জাতি তাদের বিবাহিত কিন্তু মাতৃত্ব লাভ না করা মানবী কন্যাকে সন্তান লাভের পদ্ধতিগুলি আচরণ করিয়ে চারা গাছগুলিকে শস্যদানা ধরানো বিষয়ক শিক্ষা দান করার কল্পনাতে কুড়মি জাতি করম পরব পালন করে। ফল ধরাশস্য দানাগুলি অকাল মৃত্যু অর্থাৎ খেঁখরি, চেপরি, আগড়িতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে দানাপূর্ণ শস্য দানা হওয়া এবং অকাল ঝরে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কামনাতে কুড়মি জাতি জিউতিআ জিতিআ পরব পালন করে। ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগের মধ্যে শস্য গাছ গর্ভধারণ করা কুড়মলি ভাষাতে ডেঁবুআন বা টেরটেরান পর্যায়ে পৌঁছায়। এরপর শস্য দানা শিস ফুটিয়ে তোলার পালা। শস্য গাছ শস্য দানা শিস নির্বিঘ্নে অক্লেসে ফুটিয়ে তুলতে পারে সেই বিশ্বাসে কুড়মি জাতি আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যাহা মহাঅষ্টমী নামে পরিচিত সেই তিথিতে সাধভক্ষণ করানোর (কুড়মালি ভাষাতে সধউড়ি খাউআউঅ) প্রতীক খেত জাগানো (জাগাউঅন) পরব দসা শব্দ থেকে সৃষ্ট দেঁসেই পরব পালন করে । শিস ধরা শস্য গাছে ভরা শস্য ক্ষেত। এই শস্য গাছ ক্ষেত থেকে তুলে এনে সংরক্ষণ করার জন্য খামারের প্রয়োজন। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন কুড়মি জাতি খামার তৈরী করা কাজের সূচনা করাকে কেন্দ্র করে জিউইরহু শব্দদ্বয় থেকে সৃষ্ট জিরহুল পরব পালন করে। কোনো এক অদৃষ্ট শক্তি যা কুড়মি জাতির খামারে সংরক্ষণ করা শস্য দানা রক্ষা করার রক্ষা কবচ সেই শক্তিকে খামারে স্থাপন করাকে জিউই হুর অর্থাৎ বেঁচে থাকো অর্থাৎ সজাগ থাকো বলা হয়েছে। আশ্বিন মাসের সমাপ্তি। কার্তিক মাস চলমান। কোনো কোনো সশ্য দানাতে পাক ধরেছে। কোনো শস্য দানা পাক ধরার মুখে। কৃষিজীবি কৃষক কুড়মি জাতির এবং কৃষির সহায়ক পশু গোমহিযাদির কঠোর পরিশ্রমে উৎপাদিত এই শস্যদানা। পরিশ্রমের সার্থকতাতে উভয়ের মন প্রাণ আনন্দে ভরপুর। আনন্দ উপভোগের বহিপ্রকাশই বাঁদনা বা

সেঁহরেই পরব। সুস্বাস্থ্য আনন্দ উপভোগের উৎস। পরিচর্যা সুস্বাস্থ্যের উৎস। তাই কুড়মি জাতি এই পরবে গোমহিষাদিকে পরিচর্যা করে থাকে এবং আগামী বৎসরেরও সুস্থ থাকার কামনাতে বঁদে অর্থাৎ প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন করে তুলে। তারপর গিত গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে নাচ নেচে এবং নাচিয়ে এবং নাচানোর মাধ্যমে কুড়মি জাতি বাঁদনা পরবের আনন্দ উপভোগ করে। অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে কৃষক কুড়মি জাতি পরিপক্ক শস্য দানার গাছ কেটে খামারে এনে মজুত করার কাজ সম্পন্ন করে। তাই সংক্রান্তির দিন ডিনি মাঁইকে অর্থাৎ শস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে খেত থেকে অর্থাৎ মাঠ থেকে এনে খামারে স্থাপন করা হয়। একে ডিনি মাঁই আনা বলা হয়। ডিনি কিন্তু মাঁই অর্থাৎ মা। মা সৃষ্টিশীলা হতে পারেন না। বাড়ীতে অবস্থান করে ছেলেপুলের আহারে যোগান দেন। এমতাবস্থাতে আগামী মরসুমে কৃষিকর্ম করার পরিকল্পনাতে উক্ত দিবসেতেই টুসুর স্থাপনা করা হয়। তাই কুড়মি জাতি অঘন সাঁকরাইতে ডিনি মাঁই আনা আর টুসু থাপনা পরব পালন করে। সূর্য্যদেবের দক্ষিণায়নে অবস্থান থাকা কালে কৃষিজ শস্যদানা বিশেষ করে ধান শস্যদানার অঙ্কুরিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে না অর্থাৎ ধান শস্যদানা অঙ্কুরিত হয় না। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে দক্ষিণায়নের পরিসমাপ্তি ঘটে। তৎসূত্রে বলা যেতে পারে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে ধান শস্য দানার অঙ্কুরিত না হওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই কুড়মি জাতি পৌষ সংক্রান্তিকে কুড়মালি ভাষাতে মকর সাঁকরাইত বলে। মকর শব্দটি গঠিত হওয়ার অক্ষরগুলি তান্ত্রিক কুড়মি জাতির তন্ত্রসাধনাতে ব্যবহৃত প্রতীক অক্ষর। মকর শব্দটির ব্যুৎপত্তি এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সাঁকরাইত শব্দটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। বাংলা ভাষার শঙ্খ শব্দের কুড়মালি ভাষাতে প্রতিশব্দ সাঁক। শঙ্খ অর্থাৎ সাঁক দুমুখো হয়ে থাকে। একটি মুখে বায়ু প্রবেশ করে অপর মুখে প্রবিষ্ট বায়ু শব্দ সৃষ্টি করে নির্গত হয়। তদ্রুপ সাঁকরাইত দিনের রাত্রির ভিনসার পহরের অর্থাৎ প্রহরের পূর্ব মুহূর্তে চলতি মাসের পরি সমাপ্তি ঘটায় এবং ভিনসারে আগত মাসের প্রারম্ভ সূচনা করে। কুড়মালি ভাষাতে জন দিনকর রাইর সাঁক নিআঁর বাংলা ভাষাতে যে দিনের রাত্রি শঙ্খ সদৃশ্য সেই দিনটিকে সাঁকরাইত দিন বলা হয়। যেহেতু ভিনসার শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ তাই শব্দটির অর্থ, ভাবার্থ প্রকাশের প্রয়োজন। ভিনু এবং সার শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে ভিনসার শব্দটি গঠিত। ভিনু শব্দের অর্থ অন্য এবং সার শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। অতএব ভিনসার শব্দের শাব্দিক অর্থ অন্য শ্রেষ্ঠ। কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীকে এই বিষয়ের স্পষ্টীকরণ না হওয়া পর্যন্ত বাক্যটি অর্থহীন। কুড়মি জাতিতন্ত্র সাধনার দ্বারা উলবব্ধি করেছিল তেজসতত্বের উৎস সূর্য্যদেব, সৌরজগৎ-বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির উৎস সূর্য্যদেব শস্যাদি সৃষ্টির উৎস সূর্য্যদেবকে কুড়মালি ভাষাতে সার শব্দে ব্যক্ত করেছে। সূর্য্যদেব দৈনন্দিন উদিত হন অর্থাৎ বর্তমান থাকেন এবং অস্ত যান অর্থাৎ অতীত হন। অতীত সব সময় অতীত। অতীতের মধ্যে বর্তমানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বর্তমান যিনি স্বাভাবিকভাবে অতীতের ভিনু অর্থাৎ অন্য তিনি। তাই যে প্রহরে(পহরে) সূর্য্যদেব আগত দিনে বর্তমান অর্থাৎ উদিত হওয়ার মুখে থাকেন কুড়মি জাতি সেই প্রহরকে ভিনুসার ভিনসার বলেছে।

কুড়মালি ভাযার মকর সাঁকরাইত এমনি একটি সাঁকরাইত যে সাঁকরাইতটি একাধারে কৃযিজ শস্যদানা বিশেযভাবে ধান শস্যদানার অঙ্কুরিত না হওয়া পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং অপরদিকে অঙ্কুর সৃষ্টি হওয়া পর্যায়ের সূচনা করে। স্মরণ রাখতে হবে পুরুয ও প্রকৃতির মিলন ব্যতীরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। তাই কুড়মি জাতি চলতি মরসুমে উৎপাদন করা টু মানে পুরসটঅ বাংলা ভাযাতে পরিপুষ্ট শস্যদানাকে তার সু মানে স্বামী সহমিলন হেতু তার শশুরালয় মানে প্রবাহিত জলস্রোতে পাঠানোর অর্থাৎ বিদায় দেওয়ার মাধ্যমে আগত মরসুমে পুনঃরায় শস্যদানা ফলানোর কামনাতে কুড়মি জাতি টুসু পরব পালন করে। এই টুসু পরবকেই মকর পরব, পুস পরব বলা হয়।

উল্লেখিত আখাইন থেকে মকর তেরোটি পরব কুড়মি জাতি নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করা জ্ঞানে ধর্মীয়। পরবরূপে পালন করে। উক্ত তেরোটি পরবের সৃষ্টির মূলে রয়েছে কৃষিকর্ম। কুড়মালি সংস্কৃতির অনুষ্ঠান মুলকে সংস্কৃতি গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে কৃযিকর্ম আধারে সৃষ্ট তেরো পরব। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজ জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পেশা কৃযিকর্ম তাই নিশ্চিতভাবে কুড়মি জাতি কৃষিকর্মের উদ্ভাবক এবং বর্তমানে ও ধারক এবং বাহক।

চতুর্থতঃ দুর্গাপূজার (দেঁসেঁই পরববাসি) পরিসমাপ্তির পর কালীপূজার (বঁদনা পরবকর উচরণ আগু) প্রারম্ভের পূর্বে কুড়মি সম্প্রদায়ের নারী সমাজ প্রতি বৎসর নিজ মালিকানাতে থাকা সমস্ত ঘর বাড়ী পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন করে। ঘরের দেওয়াল সংস্কার করে। দেওয়াল সংস্কার করার সময় তারা অভ্যাসবশতঃ অজ্ঞানে দেওয়ালের নিম্নভাগে নীচে উপরে পর পর সাজিয়ে স্বত্বগুণের প্রতীক সাদা, রজঃগুণের প্রতীক লাল এবং তমগুণের প্রতীক কালো এই তিন রঙের তিনটি পাড় অঙ্কন করে। উক্ত পাড়গুলির মধ্যে যথাযোগ্য রঙে লতা, গাছ, বসে থাকা অবস্থার ষাঁড়, অজ্ঞাত এবং অপরিচিত ত্রিকোনাকৃতি চিত্র অঙ্কন করে পাড়গুলিকে সাজিয়ে তোলে, দেওয়ালের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। উক্ত চিত্রগুলির গঠন, রূপ এবং আকৃতি হুবহু সিন্ধু সভ্যতাতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের চিত্র সমূহের অনুরূপ, সমতুল্য মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে নিজগৃহের মাটির দেওয়ালে প্রতিবৎসর সিন্ধু সভ্যতার চিত্র শিল্পের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করে কৃযিকর্মের অবকাশবিহীন কর্ম ব্যস্ত কুড়মি জাতি সিন্ধু সভ্যতার চিত্র শিল্পকে আঁকড়ে রেখেছে, ধারণ করে চলেছে, বহন করে রেখেছে। সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠার মূল আধার শক্তি কৃযিকর্ম। উল্লেখিত তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী একাশীগুষ্টিধারী কৃষিজীবি কুড়মি জাতি কৃষিকর্মের সাথে সাথে তন্ত্র ধর্মের উদ্ভাবক, প্রবর্তক। এতৎ অনুমান করা যায় সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কুড়মি জাতির অবদান সর্বাধিক।

বলা হয়েছে তন্ত্র ধর্ম প্রকাশের ভাযা দ্রাবীড় ভাযা। দ্রাবীড় একটি রাজ্য। রাজ্যে বহু ভাযা প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। তন্মধ্যে যেভাযাটি রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জানতো বুঝতো অহরহ কথোপকথনে ব্যবহার করতো বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিশ্চয় সেই ভাযাটিকে দ্রাবীড় ভাযা অর্থাৎ দ্রাবীড় রাজ্যের রাজ্য ভাযা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দ্বারা

স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন কোন ভাষা উক্ত গুণসম্পন্ন ভাষারূপে উক্ত রাজ্যে প্রচলিত ছিল। লিখিত প্রমাণ পাওয়ার অভাবে স্পষ্টীকরণের সূত্র যে জনগোষ্ঠী মানুষের সাথে অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে সংযোগীকে যার সাথে সংযোগের প্রয়োজন তার মাতৃভাষা লিখতে বলতে বুঝতে দায়বদ্ধ হতে হয়। কুড়মি জাতি কৃষিকর্ম উদ্ভাবন করে উদর পুরনের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তু কৃষিজ শস্যদানা আহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কৃষিকর্ম প্রচুর শ্রমি সাপেক্ষ কর্ম। প্রচুর শ্রমদানের জন্য প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন। কৃষক কুড়মি জাতি নিজ প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষাভাষীর মানুষজনকে কৃষি শ্রমিকরূপে নিযুক্ত করতে শুরু করেছিল। উক্ত যুগে মুদ্রার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং শ্রমের বিনিময়ে দ্রব্য, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য, শ্রমের বিনিময়ে শ্রম প্রথা প্রচলিত থাকার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষি শ্রমিক কৃষক কুড়মির কৃষিকর্মে শ্রমদানের বিনিময়ে মজুরী (বেরহন) পেতে উদর পুরনের কৃষিজ শস্যদানা ধান। উক্ত ধান গ্রহণ করার জন্য কৃষি শ্রমিক কুড়মির বসতবাটিতে আসা অনিবার্য ছিল। স্বাভাবিকভাবে কৃষি শ্রমিক কুড়মির পরিবারের সকল সদস্যের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতো এবং কুড়মির মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষা রপ্ত করার সুযোগ পেতো। এইভাবে অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষজনের সমাজে কুড়মালি ভাষার সম্প্রসারণ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ কুড়মালি ভাষা আদিবাসী ভাষা পরিবারের ভাষা হওয়ার সুবাদে অন্যান্য আদিবাসী ভাষার বহু শব্দ কুড়মালি ভাষার সাথে এক হওয়াতে এবং নাসিক্য উচ্চারণ, সন্ধিবর্জিত শব্দ উচ্চারণে সকল হওয়ার কারণে সকলের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য প্রথার মাধ্যমে কুড়মালি ভাষার বিস্তার লাভ —

কুড়মি জাতি পেশাতে কৃষক। কৃষিকর্মের দ্বারা মানুষের প্রথম এবং প্রধান চাহিদা উদর পূরনের খাদ্য সামগ্রি উৎপাদন করা তাদের পেশা। সমাজে বহু পেশাধারী মানুষের বসবাস। কিন্তু কুড়মির পেশা ব্যতীরেকে অপর কোনো পেশাধারীর পেশাতে উৎপাদিত দ্রব্যের মানুষের প্রাথমিক চাহিদা উদর পূরণ হয় না। স্বাভাবিকভাবে উপকরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় পারিবারিক দ্রব্যের বিনিময়ে নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কুড়মির নিকট থেকে বিনিময় করে সংগ্রহ করতে কুড়মির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে দায়বদ্ধ ছিল।

দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য প্রথা প্রচলিত থাকার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কুড়মালি ভাষার একটি প্রবাদ বাক্য। প্রবাদটি হলঃ- বাহারে কুড়মিনকর জিউ এক সের নুনে তিন সের ঘিউ।। বাহারে শব্দের অর্থ-বলিহারি, সাব্বাস। কুড়মিন কর অর্থ মহিলা কুড়মির। জিউ শব্দের অর্থ জীবন। একসের শব্দের অর্থ পরিমাণ মাপক একক। ঘিউ অর্থ ঘৃত। প্রবাদ বাক্যটির মোটামোটি অর্থ প্রাক্‌বৈদিক আদিম যুগে অর্থাৎ যে যুগে সামুদ্রিক লবন আবিস্কৃত হয়নি সেই যুগে কুড়মি জাতি ভেষজ লবন ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। সামুদ্রিক লবন আবিস্কার হওয়ার পর লবণ ব্যবসায়ী লবন ব্যবসাতে কুড়মি অধ্যুষিত এলাকা শিখ-শিখর-নাগপুর-আধাআধি খড়গপুর এলাকাতে এসে পৌঁছায়। সামুদ্রিক লবনের স্বাদে কুড়মিন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং লবন সংগ্রহ করতে বদ্ধ

পরিকর হয়।

সেই সুযোগে চতুর লবন ব্যবসায়ী বহন যোগ্যতার অজুহাতে ঘৃতের বিনিময়ে লবন বিনিময় করতে সম্মত হয় এবং ব্যবসায়ীর কত পরিমান লবনের বিনিময়ে কুড়মিনকে কত পরিমান ঘৃত বিনিময় দিতে হবে অর্থাৎ বাক্যলাপের মাধ্যমে লেনাদেনার পরিমান স্থির হয়। স্থিরীকৃত পরিমাণ ব্যবসায়ীর একসের পরিমান লবনের বিনিময়ে কুড়মিনকে তিনসের পরিমান ঘৃত বিনিময় দিতে হবে। এক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীকে কুড়মিনের নিকটে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু কুড়মিন স্ত্রীজাতি, উক্ত যুগে স্ত্রীজাতির পক্ষে নিজ মাতৃভাষা ব্যতীরেকে অন্য ভাষা জানা কল্পনাতীত তাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য বাক্যালাপের ভাষা নিশ্চিতরূপে কুড়মালি ভাষা ছিল। এভাবেই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বাধ্য হয়ে কুড়মালি ভাষা আয়ত্ত করেছিল। সমাজের আনাচে কানাচে কুড়মালি ভাষার বিস্তার লাভ ঘটেছিল।

শ্রমের বিনিময়ে শ্রমের মাধ্যমে কুড়মালি ভাষার সম্প্রসারণ—

শ্রমের বিনিময়ে শ্রম প্রথাকে কুড়মালি ভাষাতে অসরিপসরি বলা হয়। এই প্রথাটি কুড়মি সমাজে বহুল প্রচলিত প্রথা। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কৃষিকর্ম যেমন প্রচুর শ্রম সাপেক্ষ তেমনি সময়ানুবর্তিতা সাপেক্ষও বটে সময়মত কর্ম সম্পাদন করাতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সময়মত শস্য রক্ষা করাতে অক্ষম হলে শস্যহানি হয়। সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক সংগ্রহ করা অসম্ভব হয় অথচ শ্রমের বিনিময়ে শ্রমদানে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয় সহজ হয় সেক্ষেত্রে শ্রমের বিনিয়মে শ্রমদানে সম্মত হয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। সহাবস্থানের কারণে প্রতিবেশী সকলেই সকলের পেশাগত কর্মে সহায়করূপে কাজ করার কৌশল করায়ত্তে রাখে তাই বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন পেশাগত কর্মে শ্রমদানের যোগ্যতা কম বেশী সকলেই রাখে। তাই শ্রমের বিনিয়মে শ্রমদান সম্ভব ছিল। সমপেশার সাথে সমপেশাতে শ্রমের বিনিময়ে শ্রম সার্থক বটে। কৃষিকর্মে নির্ধারিত কর্ম থাকে না। নির্ধারিত কর্ম করতে গিয়ে কৃষি বিষয়ক অন্য কোনো কর্ম জরুরি হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে জরুরি কর্মটি প্রথমে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিকভাবে কর্মটি বুঝিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়ার জন্য বাক্যালাপের প্রয়োজন পড়ে। বাক্যালাপের মাধ্যমে ভাষা নিশ্চিতভাবে কুড়মালি ভাষা কারণ কর্মব্যস্ত কুড়মিজাতি। অন্যান্য ভাষা আয়ত্ত করার সুযোগ পায় না, প্রয়োজন বোধ করে না। সারাদিন এক সাথে থেকে একই কর্ম করতে গিয়ে গালগল্পে মজে থাকা স্বাভাবিক। উদ্ধৃত কারণে এই গালগল্পের ভাষা নিশ্চিতরূপে কুড়মালি ভাষা। এভাবেই কুড়মালি ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে, বিস্তার লাভ বৃদ্ধি পেতে থাকে, জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। যার ফলে দ্রাবীড় রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। সমস্ত দ্রাবীড় রাজ্যের ভাষা ভাষার মান্যতা প্রাপ্ত হয়, মর্যাদা লাভ করে। এমতাবস্থাতে অনুমান করা যায় তন্ত্র ধর্ম প্রকাশের ভাষা স্পষ্টভাবে তান্ত্রিক কুড়মি জাতির মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষা স্পষ্টীকরণে পন্ডিতগণ হয় তো কৃপনতা করেছেন নতুবা ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন। যাই হোক, উল্লিখিত ঘাটতিবিহীন

আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় তন্ত্র ধর্ম প্রকাশের ভাষা কৃষিকর্ম এবং তন্ত্রধর্ম উদ্ভাবক তান্ত্রিক কুড়মি জাতির মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষা।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে তন্ত্রের সংযুক্তি

শরীরী সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারে তন্ত্র সাধনার ক্রিয়ার সংযুক্তি ঃ- অনুমান করাটা বোধ হয় ভুল হবে না যে মানব সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে মানবেতর প্রাণী সকলের মত মানব জাতি ও নিচখ যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি হেতু নারী-পুরুষ যৌন মিলনে মিলিত হতো। উক্ত মিলনের ফলে সৃষ্ট শিশুর সেবাযত্নের, রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার যদ্যপি নারী সাধ্যমত বহন করতো কিন্তু পুরুষ সম্পূর্ণ দায়মুক্ত, কর্ত্তব্যমুক্ত থাকতো। ফলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্ট শিশু অপরাপর বন্য জীব-জন্তুর আহার্য্য বস্তুতে পরিণত হতো। মানব সমাজে বংশবৃদ্ধি ঘটতো না বরং হ্রাস পেতো। সীমিত ক্ষমতা থাকা সত্বেও নারী একাকী সৃষ্ট শিশুকে নিজ হেপাজতে রেখে সেবাযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ করতো তাই পরিণত বয়সে উক্ত শিশু মায়ের অনুগত হতো। এই আনুগত্যের হাত ধরেই মানব সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আমার মনে হয় মানব সমাজের মধ্যে কুড়মি সমাজ সর্বপ্রথম বিবাহ সংস্কার পালনে করে। নারীর প্রাধান্য অধিক বলবত আছে। তাই তো কুড়মালি ভাষাতে বলা হয় বিহা ঘারে মেহরারু মালিক। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত বয়সে উত্তীর্ণ হওয়া ছেলেমেয়েরা পাছে জঠর ক্ষুধা যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি হেতু মাতৃমোহ পরিত্যাগ করে সেই সন্দেহে সন্দিহান হয়ে ছেলেমেয়ের প্রাক্‌যৌবন কাল বয়সকে অর্থাৎ কিশোর বয়সকে কুড়মালি ভাষাতে পহনা উমেইরকে বিবাহ করার বয়স নির্ধারিণ করেছে।

কুড়মি জাতি উপলব্ধি করেছিল অবাধে যত্রতত্র যৌন মিলন এবং সৃষ্ট শিশুর সেবাযত্নে রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা ভগেবানে ভগবানকে অবহেলা করার সমতুল্য অপরাধ। বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে হানিকারক। এই বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ভাবনা থেকে কুড়মি সমাজে বিবাহ প্রথার প্রচলন এবং বিবাহ সংস্কারে মাড়ুআ পূজা সংস্কার পালনের সংযুক্তি।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে অধিবাস দিবসে কুড়মালি ভাষাতে এইদবাস দিনে ছামড়া বাঁধার পর মাড়ুআ পুজা সংস্কার পালন করা হয়। যেহেতু অধিবাস দিবসে পালনীয় সংস্কার তাই বর এবং কনে উভয়ের বাড়ীতে পৃথক পৃথকভাবে মাড়ুয়া পূজা সম্পন্ন করা হয়। মাড়ুয়া পূজা করার নির্দিষ্ট স্থান মড়ই থানের অর্থাৎ তুলসী মঞ্চের সম্মুখ ভাগ। উক্ত পূজা করার একমাত্র অধিকারী আজাবাপ অর্থাৎ দাদু। মাড়ুআ পূজার প্রথম এবং প্রধান নেগ অর্থাৎ নিয়ম মাড়ুআ বাঁধা। বরের বাড়ীতে বরের দাদু মড়ই থানের অর্থাৎ তুলসী মঞ্চের সম্মুখ ভাগে বর্গাকার আকারে চার কোনে চারটি গর্ত খুঁড়ে চারটি কচি শাল গাছ নতুবা শাল গাছের প্রশাখা পুঁতেন। প্রোথিত প্রশাখাগুলি মাঝখানে পৃথক একটি গর্ত খুঁড়ে হাতে কচি শাল, সিধা, আমগাছ অথবা উক্ত গাছগুলির প্রশাখাকে একত্রিত করে পুঁতেন তারপর প্রোথিত তিনটি প্রশাখাকে

একত্রিতভাবে খড় নির্মিত মোটা দড়ি কুড়মালি ভাষাতে বড় দিয়ে আড়াই পাক ঘুরিয়ে বাঁধেন। এই আড়াই পাক ঘুরিয়ে বাঁধাকে মাড়ুআ বাঁধা বলা হয়। অনুরূপভাবে কনের বাড়ীতে কনের দাদু মাড়ুআ বাঁধেন একটু ব্যতীক্রম এই যে কনের ক্ষেত্রে আমগাছের পরিবর্তে মহুআ গাছের প্রশাখা ব্যবহার করা হয়। মোদ্দা কথা বরের ক্ষেত্রে আম এবং কনের ক্ষেত্রে মহুআ ব্যবহার করা হয়।এই পৃথক বিষয়ে আম মউরা খাওয়ানো মহুআ মউরা খাওয়ানো সংস্কারে আলোচনা করা হয়েছে। কম নয় বেশি নয় মাত্র আড়াই পাক ঘুরিয়ে বাঁধা বিষয়ে আলোনা করা শ্রেয়। মাত্র আড়াই পাক ঘুরিয়ে বাঁধার মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে মাড়ুআ বাঁধার আসল রহস্য। জীবদেহে মূলাধার চক্রে কুলকুন্ডলিনী আড়াইপাক ঘুর পাক খেয়ে সুষুপ্ত অবস্থাতে থাকেন আড়াই পাক ঘুরিয়ে মাড়ুয়াবাঁধা কুলকুন্ডলিনীর প্রতীক। শ্বাসাঘাতে কুলকুন্ডলিনীকে জাগ্রত করা হয়। তাকে জাগ্রত করাতে সত্য বস্তুর সাক্ষাৎকার ঘটে। জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ ঘটে। প্রারব্ধ কর্মে একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা আসে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অর্থ পুরুষ স্ত্রীর জঠর ক্ষুধা নিবৃত্তি করার দায়ভার বহন করা এবং স্ত্রী পুরুষের যৌন ক্ষুধা নিবৃতি করার দায়ভার বহন করার সাথে উভয়ে একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠ মনে পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ভালবাসা দিয়ে পরস্পর অনুগত থেকে সুখময়, শান্তিময়, মধুময় দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা। উভয়ের সৃষ্ট বংশবৃদ্ধির বংশধর শিশুর সেবা যত্নের, রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার উভয়ে সমভাবে বহন করা। কুলকুন্ডলিনী জাগ্রত করাতে বর এবং কনে উল্লিখিত পরম সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার ঘটে। স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞানচক্ষুর সঞ্চার ঘটে। বর এবং কনের প্রারব্ধ কর্ম বংশবৃদ্ধি করা। উক্ত প্রারব্ধ কর্মে বর এবং কনের মনের মধ্যে একাগ্রতা জাগে একনিষ্ঠতার সঞ্চার ঘটে। উল্লেখিত উদ্দেশ্য সমুহের পরিপূর্ণতা লাভের কামনাতে কুড়মি জাতি কুলকুন্ডলিনীর প্রতীক আড়াই পাক ঘুরিয়ে মাড়ুআ বাঁধে।

দ্বিতীয়তঃ দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ঘুমন্ত অবস্থাতে মুখে হাসি মনে দুঃখ পাওয়ার বেদনাহীন ছবি মুখে ফুটে ওঠার আধারে এবং কৃষিজীবি কুড়মি জাতির গৃহস্থালী পাঁচমেশালী কাজের ব্যস্ততাতে বহুক্ষেত্রে শিশুর মা শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থাতে প্রাকৃত অপ্রাকৃতবিপদ আপদের হাত থেকে শিশু রক্ষা পাওয়া সহায়কতাকে কেন্দ্র করে কুড়মি জাতি কল্পনা করেছিল উক্ত সহায়তার অন্তরালে কোনো শক্তির আশীর্বাদ আছে। সেই শক্তিটা পুরুষ শক্তি হতে পারে না কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশু পুরুষ নির্ভরশীল নয়। একমাত্র মা অর্থাৎ মাতৃশক্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর নির্ভরযোগ্য শক্তি। কিন্তু মাতৃশক্তির মধ্যে মাঁহাঁমাঁই হতে পারে না কারণ তিনি সৃষ্টির আধার শক্তি। অপরদিকে জন্মদায়িনী মানবী মা সে শক্তি হতে পারেন নাকারণ তিনি জন্মদায়িনী এবং দুগ্ধদায়িনী মানবী মা। অতএব উক্ত দুই মাতৃশক্তির সম্মিলিত তৃতীয় মাতৃশক্তির স্থান থাকা কল্পনা করেছিল। কুড়মালি ভাষাতে স অক্ষরটি স্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রী শক্তি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। বাংলা স্থান শব্দের কুড়মালি ভাষাতে প্রতিশব্দ ঠিন। তাই দুই মাতৃশক্তি অর্থাৎ স্ত্রী শক্তির প্রতীক দুই স এবং ঠিন শব্দের প্রতীক ঠি এর সংযুক্তিতে সৃষ্ট সসঠি (ষষ্ঠী) শব্দে তৃতীয় মাতৃশক্তির নামকরণ করা হয় সসঠি মাঁই। সসঠি মাঁই সৃষ্টির

আধারণ শক্তি নন এবং জন্মদায়িনী, দুগ্ধদায়িনী মা নন কেবলমাত্র শিশুরক্ষয়িত্রী মা সসঠি মাঁই। এই শিশুরক্ষয়িত্রীমা সসঠি মাঁই এর আশীর্বাদে দুগ্ধপোষ্য শিশু একাকী হাসে, খেলা করে সুস্বাস্থ্যবান হয়ে উঠে অর্থাৎ বংশবৃদ্ধির উত্তর পুরুষ দুগ্ধ পোষ্য শিশু শিশুর রক্ষয়িত্রীদেবী সসঠি মাঁই এর কৃপাদৃষ্টিতে নিরোগী সুস্বাস্থ্যবান থেকে বেড়ে উঠে। সূর্য্য কিরণের উত্তাপ গায়ে তেল মাখানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে উঠানে শোয়ানো কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। কুড়মি সমাজ উঠানে মড়ই থান অর্থাৎ তুলসী মঞ্চ স্থাপন করে। উঠানে শুয়ে থাকা শিশুর প্রতি সসঠি মাঁই এর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে সফল করার উদ্দেশ্যে এবং যেহেতু তিনি জীবন-জীবিকা নির্বাহের কোনো অধিষ্ঠাত্রীদেবী নন তাই তাঁর পীঠ তুলসী মঞ্চে অর্থাৎ মড়ইথানে স্থাপন করা শ্রেয়। মড়ই শব্দ থেকে মাড়ুআ শব্দের সৃষ্টি। সেই আধারে যে পুজা মড়ইথানে অর্থাৎ শিশুরক্ষয়িত্রীদেবী সসঠি মাতার পীঠস্থানে সসঠি মাতার উদ্দেশ্যে করা হয় সেই পূজাকে মাড়ুআ পুজা বলা হয়। মাড়ুআ পুজা বিবাহ পূর্বে অধিবাস দিবসে করা হয়। একাশীগুষ্টিধারী সকল গুষ্টির মধ্যে মাড়ুআ পুজার প্রচলন দেখা যায় না। কিন্তু সকল সন্ধ্যা দুই বেলা অনিবার্য্যভাবে শিশুকে তেল মালিশ করানো, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানাবিধ কসরৎ করানোর সময় সকল গুষ্ঠীর মা, আজিমারা সসটি মাতার আরাধনা মুলক একটি ছড়া আওড়ান। ছড়াটি হলোঃ- কাঠ বাঁধঅঁ, পাত বাঁধঅ। দতুন বাঁধঅ, বাবুকে /মিঁআঁকে বাঁধেই বাবু মিঞা বাড়েই অরইবাশ, পইনা পাহাড়। সসঠি মাঁইকে করাউএঁই গড়। অরই বাঁশ - যে বাঁশে কঞ্চি হয় না সোজাসোজি প্রচুর লম্বা হয়ে বেড়ে উঠে। পইনা পাহাড় - লাঙ্গল চষার সময় যে লাঠি ব্যবহার করা হয় কুড়মালি ভাষাতে সেই লাঠিকে বলা হয় পইনা। পইনার গড়ন হয় হাতে ধরার দিকে অর্থাৎ গোড়ার দিকে সামান্য মোটা তারপর ক্রমান্বয়ে আগাদিকে অর্থাৎ অগ্রভাগ সরু অর্থাৎ পাতলা হয়। পইনার সদৃশ্য যে পাহাড় সেই পাহাড়কে পইনা পাহাড় বলা হয়। আরো স্পষ্টীকরণের জন্য উল্লেখ করি জৈনাগমনের পূর্বে কুড়মি জাতি বর্তমানের পরেশনাথ পাহাড়ের কুড়মালি ভাষাতে নামকরণ করেছিল পইনা পাহাড়। এক কথায় অতীতের পইনা, পাহাড় আগ্রাসন নীতিতে বর্তমানে পরেশনাথ পাহাড়। কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডার পর্য্যায় বাচক শব্দে ভরপুর। বিভিন্ন পর্যায়ের লাঠিকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। লাঙ্গন টানা বলদকে খেদানোর লাঠির নাম পইনা। এবং গরুর মধ্যে লাঙ্গল টানা বদলকে বলা হয় বইনা। পইনা দিয়ে বইনা খেদানো হয়। অর্থাৎ কৃষি স্রষ্টা কৃষিজীবি, কৃষক কুড়মি জাতি পইনা দিয়ে কৃষিকর্ম করে থাকে।

যাক, মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক্ সুদুর দশ বারো হাজার আতীতে গড়ে ওঠা কুড়মালি সংস্কৃতির শরীরী সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত মাড়ুআ পুজার আরাধ্যা দেবী শিশুরক্ষয়িত্রী সসটি মাতাকে অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত জিতিআ পরবের জিতিআ পুজার আরাধ্যা দেবী কল্পনা করে থাকেন। এই ধরনের কল্পনা অবাস্তব, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক এবং কুড়মালি সংস্কৃতি বিরোধী কারণ প্রথমতঃ মাড়ুআ পুজা শরীরী সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত অপরদিকে জিতিআ পুজা অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ মাড়ুয়া পুজা শিশুরক্ষয়িত্রী দেবী সসঠি মাতার পুজা। অপরদিকে জিতিআ পুজা শস্য অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্যদেবের পুজা। কুড়মালি

সংস্কৃতির অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতির বারো মাসে তেরো পরবের সবগুলি গড়ে ওঠার উৎস কৃষিকর্মের পর্যায় ভিত্তিক ধারাবাহিকতা। অপরদিকে শরীরী সংস্কৃতি গড়ে উঠার উৎস শরীর সৃষ্টি হওয়ার পূর্বাবস্থা থেকে শরীর বিনাশ প্রাপ্তির পর মোক্ষলাভ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করা।

শরীরী সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত বিবাহ সংস্কারে বর এবং নববধূকে অভ্যর্থনা জানানো কালে (পরছন বেরা) ডবকানাচ নাচাঃ-- কনে বাড়ীতে বর এবং কনের অবশ্য পালনীয় বিবাহ সংস্কারের সমস্ত সংস্কার বিধি সম্মতভাবে পালনের মাধ্যমে বিবাহ কায্যাদি সম্পন্ন করার পর বরযাত্রী সমভিব্যাবহারের বর নববধু বড় বাড়িতে প্রত্যাগমন করার সময় বর বাড়ীর লোকের বর এবং নবধূকে অভ্যর্থনা জানানো (পরছন) প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। অভ্যর্থনা জানানো কুড়মালি ভাষাতে পরছন বলা হয়। পরছন সংস্কারের প্রধান সংস্কার ডবকা নাচ নাচা। বরের বাবা বরকে এবং কনের শাশুড়ীকে কনেকে কোলে চড়িয়ে ডবকা নাচ নাচা প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে। স্মরণে রাখবেন কুড়মি সমাজে ছেলেমেয়ের কিশোর বয়স (পহনা উমেইর) বিবাহ সংস্কার পালন করার মান্যতা প্রাপ্ত বয়স। কিশোর বয়সের পুত্র এবং পুত্র বধূকে কোলে চড়িয়ে নৃত্য করা কষ্টসাধ্য নয় বরং আনন্দ বর্দ্ধক বটে। ডবকা শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ লাফিয়ে ওঠা মাত্রাযুক্ত ভাবে লাফিয়ে উঠে যে নাচ নাচা হয় সেই নাচকে ডবকা নাচ বলা হয়। ডবকা নাচ তন্ত্র সাধনার এক প্রকার মুদ্রা নাচ। এই নাচে অভ্যাসরত পুরুষের শুক্রকীটবাহী নাড়ী ময়লামুক্ত থাকে, শুক্রকীট প্রানবন্ত হয়ে উঠে এবং নারীর ডিম্বানু সক্রিয় থাকে, ডিম্বানুবাহী নাড়ী এবং ডিম্বাশয় পরিস্কার থাকে। শীঘ্রাতীশীঘ্র সন্তানবতী হওয়া যায়।

পিতা পুত্রকে কোলে চড়িয়ে ডবকা নাচ নাচার অর্থ অপরিপক্ক জ্ঞানহীন কিশোর বয়সের পুত্রকে ডবকা নাচ নাচার কৌশল শিখানোর মাধ্যমে উপকারিতা বিষয়ে সপ্রমাণ উদাহরণ সাব্যস্ত করা। শাশুড়ী নবপুত্রবধূকে কোলে চড়িয়ে নাচার অর্থ অপরিপক্ক জ্ঞানহীন কিশোর নবপুত্র বধূকে ডবকা নাচ নাচার কৌশল অবগত করানো এবং শীঘ্রাতীশ্রীঘ্র সন্তানবতী হয়ে শাশুড়ী হওয়ার প্রমাণ সাব্যস্ত করা। বংশবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার নির্দেশনামা জারি করা।

কুড়মালি সংস্কৃতির শরীরী সংস্কৃতির বিবাহ সংস্কারের মাড়ুআ বাঁধা এবং ডবকা নাচ নাচার সংযোজনে মনে হয় হাজার হাজার বৎসর পূর্বে অন্যান্য জীব-জন্তুর তুলনায় মানবজাতি সংখ্যা কম ছিল। তাই বিবাহ সংস্কার পালনের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল স্ত্রী লাভ করা এবং বংশবৃদ্ধির হার বাড়ানো। উক্ত উদ্দেশ্যের সত্যতা প্রমাণ হেতু কুড়মি সমাজে শশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করাকালে প্রাপ্ত আশীর্বাদ বানী জা বেটা পাঁচবেটাক বাপ হেবে। উক্ত ঘটনাক্রম আধারে কুড়মি জাতির আদিমতা এবং তন্ত্র সাধনাতে পারদর্শীতার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে বিবাহ সংস্কারে বর মাতৃস্থানীয়দেরকে আম মউরা খাওয়ানো এবং কনে মহুয়া মউরা খাওয়ানোর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে প্রমাণ পাওয়া যায় বর দুগ্ধপোষ্য বয়সে থাকাকালে

অতি মাত্রায় বোমী করাকালে শিশুকে ওষুধরূপে আমপাতার বোঁটার রস পান করানো হতো। তাতে শিশুর বোমী বন্ধ হতো এবং পুত্র শিশুর পুরুষ সুলভ দেহগঠন হতো। কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে মহুয়া পাতার বোঁটার রস নারী সুলভ দেহ গঠনে ফলপ্রদ ছিল। বর্তমান যুগেও পৃথিবীর বহু দেশে শিশুকালে পুত্র শিশুর এবং কন্যা শিশুর দৈনিক গঠন প্রায় এক প্রায় প্রকার হয়ে থাকে। আমার মনে হয় সুদুর অতীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের পুত্র শিশুর পুরুষ সুলভ দেহ গঠন হতো। কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে মহুয়া পাতার বোঁটার রস নারী সুলভ দেহ গঠনে ফলপ্রদ ছিল। বর্তমান যুগে ও পৃথিবীর বহুদেশে শিশুকালে পুত্র শিশুর এবং কন্যাশিশুর দৈহিক গঠন প্রায় এক প্রকার হয়ে থাকে। আমার মনে হয় সুদুর অতীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে শিশুকালে সকল শিশুর ক্ষেত্রে উক্ত গুণ ফলপ্রদ ছিল। তাই কুড়মি জাতি পুত্র শিশুকে আম পাতার বোঁটার রস পান করিয়ে মাতৃদুগ্ধ বোমী করা বন্ধ করে এবং পুরুষ সুলভ দেহ গঠনের সাহায্য করে। কন্যা শিশুকে মহুয়া পাতার বোঁটার রসকে এবং মহুয়া পাতার বোঁটার রসকে অম্লরস বলা হয়। এইভাবে বনজ অবনজ সকল প্রকার লতা-গুল্ম, গাছ-গাছড়া, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের ভেষজ গুণাবলী কুড়মি জাতির করায়ত্তে ছিল, প্রয়োগবিধি জানা ছিল তারই মাধ্যমে তাদের ভেষজ বিদ্যায় পারদর্শীতায় পরিচয় পাওয়া যায়। অতীতের সেই কুড়মি জাতির উত্তর পুরুষেরা আজ সব হারাইকে লউআই থাপড়। কন্যা পনে, মদ্য পানে মুমুর্য। অতীতে যারা ছিল সভ্যতা সৃষ্টিতে অগ্রগন্য, তারা আজ সমাজের অতি নগন্য। হারিয়ে ফেললো আদিবাসীর অধিকার। পরিচয় আছে কি তাদের ওবিসি হওয়ার? ওবিসি (মেরুদন্ডহীন) করে তোকে, হারিয়ে দিল তার জাতিস্বত্ত্বাকে হায়রে কুড়মির কপাল, সংবিধান না করে তোর দেখভাল।

কুড়মালি সংস্কৃতির অনুষ্ঠান মুলক সংস্কৃতির (পরবিআ চারি মাঁহাঁন) তন্ত্রের সংযোজন ঃ- অনুষ্ঠান মুলক সংস্কৃতির (পরবিআ চারিক) প্রথম পরব আখাঁইন-জাত-রা। আখা-ইন-জাত-রা শব্দটি আগাগোড়া কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ। কুড়মালি ভাষার আখা শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ উনান অথবা উনুন। উনান অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার স্থান অর্থাৎ অগ্নিকুন্ড। উনানে অর্থাৎ আখাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকার কারণে আলোক রশ্মি এবং উত্তাপ নির্গত হতে থাকে। তদ্রূপ সূর্য্য থেকে ও আলোক রশ্মি এবং উত্তাপ নির্গত হয়ে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই উনানের অর্থাৎ আখার গুণ এবং ধর্মের সাথে সূর্য্যের গুণ এবং ধর্মের সদৃশ্যগত মিল থাকার ভাবনাতে ভাবিত হয়ে কুড়মি জাতি প্রত্যক্ষ দর্শন করা উনান অর্থাৎ আখা শব্দে সূর্য্য অর্থ ব্যক্ত করেছে।

আখা শব্দটি প্রশ্নাতীতভাবে কুড়মালি ভাষার প্রাচীনতম শব্দ ভান্ডারের শব্দ। এই শব্দটার বহুল প্রচলিত কুড়মালি ভাষাতে প্রতিশব্দ চুলহা। আমার মনে হয় হাজার হাজার বৎসর পূর্বে যে যুগে দাবানলের অগ্ন্যুৎপাতে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পরবত পুড়ে ভস্মস্তুপে পরিণত হতে কুড়মি জাতি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিল, বন থেকে বনান্তরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল সেই যুগে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, একে অপরকে জানান দিতো আইগে খালেইক। কুড়মালি ভাষার আইগে খালেইক শব্দদ্বয়ের আদ্যাক্ষর আ এবং খা অক্ষর

দ্বয়ের সংযোজনে গঠিত আখা শব্দের কুড়মালি ভাষাতে প্রতিশব্দ চুলহা এবং বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ উনান ব্যক্ত করেছে। দুই অথবা দ্বিঅধিক শব্দের আদ্যাক্ষর সংযোজনে নব গঠিত শব্দে নামকরণ করা কুড়মালি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ চুআ এবং আড়অ শব্দ দ্বয়ের আদ্যাক্ষর অন্তাক্ষরের সংযোজনে গঠিত চু আড়। কুড়মালি ভাষার চুআ শব্দের বাংলা ভাষাতে ভাবার্থ ধীর গতিতে জলস্রোত নির্গত হতে থাকা। এবং আড়অ শব্দের প্রতিশব্দ বসবাস করা তৎসূত্রে চুআড় শব্দের অর্থ ধীর গতিতে জলস্রোত নির্গত হতে থাকা স্থানে বসবাস করা। মুহাইন +জড়ন +দ+ আড়অ = মহেঞ্জদড় ইত্যাদি।

প্রচলনে অবলুপ্ত প্রায় আখা শব্দটি কুড়মালি লোকোক্তিতে কুড়মি সমাজের মহিলা মহলে টিম টিম করে প্রজ্বলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তার প্রায়ই বলাবলি করে ' অকর আঁখাঁই ধন, পাখাঁই ধন।।' কুড়মালি ভাষার অকর শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ তার। আঁখাই ধন অংশের বাংলা ভাষাতে ভাবার্থ উনানে উদর পুরনের অন্নাদি রান্না করার বিশেষ করে ভাত রান্না করার কৃষিজ শস্য দানা ধান থেকে প্রাপ্ত চালের প্রাচুর্য্যতা থাকার ইঙ্গিতবাহী। পাখাঁই ধন অংশটির ভাবার্থ উনানের সন্নিকটে পিছনের দেওয়ালে ছোট কলঙ্গা থাকে। সেই কলঙ্গাকে কুড়মালি ভাষাতে পাখা বলা হয় কুড়মি সমাজের মহিলাগণ উক্ত পাখাতে অর্থাৎ কলঙ্গাতে তেল, লবন, হলুদ, জিরা ইত্যাদির রকমারি মশলা সরংক্ষণ করে থাকে। অতএব পাখাঁই ধন মানে অপরিসীম ধনে পরিপূর্ণ।

গুণ ও ধর্ম বিচারে আখা অর্থাৎ উনান এবং সূর্য্য সমতুল্য। তাই কুড়মি জাতি আখা শব্দের সাথে ইন প্রত্যয় যোগ করে আখাইন শব্দের অর্থ প্রকাশ করেছে সূর্য্য। কুড়মালি ভাষার জাত শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ যাবে এবং রা শব্দে বিশ্বচরাচর বুঝা যায়। সামগ্রিক আখাইন জাত-রা শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ সূর্য্য যাবে বিশ্বচরাচরে। সূর্য্য দৈনন্দিন বিশ্বচরাচরে আসেন এবং যান তথাপি নির্দিষ্টভাবে মাঘ মাসের প্রথম দিনটিকে বিশ্বচরাচরে আগমন করার দিন রূপে চিহ্নিত করার, ধার্য্য করার তাৎপর্য্য সূর্য্য পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন দক্ষিণায়নে অবস্থান করা সমাপ্ত করে মাঘ মাসের প্রথম দিনে উত্তরায়নে আগমন করা শুরু করেন। সূর্য্য উত্তরায়নে আগমন করা শুরু করা সময় থেকে শুরু করে পুরোপুরি উত্তরায়নে অবস্থান করা সময়ের মধ্যে কৃষিজীবি কৃষক কুড়মি জাতির উদর পুরনের কৃষিজ শষ্য দানা আগামী মরশুমে কৃষিকর্মের দ্বারা পুনঃরায় অর্জন করার প্রক্রিয়া শস্যদানার মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে শুরু হয়ে যায়। মহাকাশ অজস্র নক্ষত্র তারকাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে নির্দিষ্টভাবে পৃথক পৃথক ছয়টি তারকাপুরের দলের উজ্জলতা নির্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধি পায়। উক্ত উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাওয়াকে কুড়মালি ভাষাতে রাইত চালাউঅন বলা হয়। উক্ত রাইত চালাউঅনকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক গুণ বিচারে কুড়মালি বর্ষ গণনাতে ছয় মাসের বিভাজন এবং ছয় মাসে বর্ষ গণনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বৎসর শুরু হওয়ার প্রথম দিন মাস মাসের প্রথম দিনটি নিদ্ধারিত হয়ে আছে। তৎসূত্রে বৎসর শুরু হওয়ার প্রথম মাস মাঘ মাস এবং বৎসরের প্রথম দিন মাঘ মাসের প্রথম দিন। যেহেতু মাঘ মাসের প্রথম দিনটি বৎসর শুরু হওয়ার প্রথম দিন

এবং সূর্য্য উত্তরায়নে আগমন করার প্রথম দিন তাই উকত দিনটি কুড়মি জাতির শুভাতীশুভ দিন। উক্ত শুভ দিনে কুড়মি জাতি তাদের জীবিকা নির্বাহ করার একমাত্র পেশা কৃষিকর্মে আড়াহাই পাকহার জতিকন হার পুনহাঁ করঅত বাংলা ভাষাতে আড়াই বেড়া লাঙ্গণ কর্ষণ করে লাঙ্গল কর্ষণ করার সূচনা করে। আড়াই বেড়া লাঙ্গল কর্ষণ করা কুলকন্ডলিনীকে জাগ্রত করা বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

চড়ক পুজাতে তন্ত্রের সংযুক্তি ঃ- কুড়মালি ভাষার চড়কা শব্দ থেকে চড়ক শব্দের সৃষ্টি। চড়কা শব্দের বাংলা ভাষাতে প্রতি শব্দ সাদা। কৃষজীবি কুড়মি জাতি প্রচলিত বারো মাসে বৎসর গণনা পদ্ধতির চৈত্র মাসের অর্থাৎ বৎসরের শেষ মাসের সংক্রান্তির দিন চড়ক পুজা অনুষ্ঠান পালন করে। অনুমান করা যায় সুদুর অতীতে কৃষিকর্ম পেশা উদ্ভাবন করা কালে ছয় মাসে বৎসর গণনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকা কালে মধু মাসে চড়ক পুজা অনুষ্ঠান পালন করা হতো। অনুমান করার আধার কুড়মির বুড়হাবাবা অন্যের শিব ঠাকুরের জনম অর্থাৎ জন্ম এবং নারতা অর্থাৎ নরতা পালন অনুষ্ঠান পালন প্রথা প্রচলিত চৈত্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ চৈত্র মাসের ষোল তারিখে ধুমইল দেওয়া হয়। শিব মন্ডপে ঢাক বাজানো হয়। শিব মন্ডপে ঢাক বাজানোকে ধুমইল দেওয়া হয়। কুড়মি সমাজে বর্তমান যুগে ও প্রসবকালে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ঘরের চালা পেটানো হয়। কুড়মালি ভাষাতে এই চালা পেটানোকে ছাঁছাঁ ঢাড়আউঅন বলা হয়। ধুমইল দেওয়া অর্থাৎ ঢাক বাজানো ছাঁছাঁ ঢাড়আউঅনের প্রতীক বুড়হাবাবা নারতা কোনো কোনো এলাকাতে তেল হেরেইদ অনুষ্ঠান পালন অর্থাৎ নরতা পালন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। জন্ম চৈত্র মাসে এবং নরতা পালন বৈশাখ মাসে প্রথা পুরোপুরি কুড়মালি সংস্কৃতি বিরোধী। ছয় মাসে বৎসর গননা পদ্ধতি প্রচলিত থাকাকালে মনে হয় মধু মাসে জন্ম এবং মধু মাসেই নরতা পালন প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত ছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক। আগ্রাসন নীতিতে সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। কোমর ভাঙ্গা কুড়মি এর বিরোধ করে নিবরং সর্বান্তিকরনে স্বীকার করে নিয়েছে।

কুড়মি সমাজে বর্ত্তমান যুগে ও জনম ছুইত অর্থাৎ জাতাশৌচ পালন করা প্রথা প্রচলিত আছে। জাতাশৌচ চলাকালে কৃষিজীবি কুড়মি জাতি কৃষিকর্মে কৃষিজ বীজ বপন করা নিষেধ নিয়ম পালন করে। তাদের বিশ্বাস জাতাশৌচ চলাকালে বপন করা বীজ অঙ্কুরিত হয় না। তদুপরি স্বয়ং কৃষিঅধিষ্ঠাতা দেবতা বুড়হাবাবার জন্ম জনিত কারনে ঘটা জাতাশৌচে সংরক্ষণ করা বীজ অঙ্কুরিত হওয়া বিষয়ে মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। সন্দেহ দূরীকরণের জন্য সংরক্ষণ করা বীজকে অঙ্কুরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করে দেখার ভাবনা থেকেই চড়ক পুজার উদ্ভব। বীজের রং যাই হোক অঙ্কুরের রংসাদা অর্থাৎ চড়কা হয়। অঙ্কুরের রং চড়কা । চড়কা অঙ্কুর সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে চড়ক পুজা বলা হয়। কৃষিজীবি কুড়মি জাতি সংরক্ষণ করা বীজকে চারদিন ব্যাপী অঙ্কুরিত হওয়ার প্রক্রিয়াতে রেখে চড়ক পুজার নেগ-চার অর্থাৎ নিয়ম সংস্কার পালন করে। চড়ক পুজার চারদিন যথা ১) ফলার ২) উপাস ৩) পৈঠা ৪) বুড়হাবাবাক নারতা। ফলার- ফলা এবং অর কুড়মালি ভাষার শব্দদ্বয়ের সংযোজনে ফলার

শব্দটি গঠিত। কুড়মালি ভাষার ফলা শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ যৌন মিলনে মিলিত হওয়া এবং অর শব্দের অর্থ উৎস। সর্বকালের শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ যৌন মিলনে মিলিত হওয়ার উৎস। স্ত্রী জাতির ঋতুস্নান যৌন মিলনে মিলিত হওয়ার উৎস। ঋতু স্নানের পূর্বে স্ত্রীজাতি যৌন মিলনে মিলিত হওয়ার যোগ্য নয়। এক্ষেত্রে ফলার দিনে করনীয় নেগ-চার বাংলা ভাষাতে নিয়ম সংস্কার পালনের মাধ্যমে কুড়মি জাতি কৃযিজ বীজের ঋতুস্নান করা পর্যবেক্ষণ করে। উপাস ঃ- উপাস শব্দের উ-কার অক্ষরটি তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর এবং কুড়মালি ভাষার পাস শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ সন্নিকট অথবা কাছ। সামগ্রিক উপাস শব্দের বাংলা ভাষাতে ভাবার্থ সৃষ্টির জন্য সন্নিকটে যাওয়া অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যৌন মিলনে মিলিত হওয়া। যৌন মিলনে পুরুষ প্রকৃতি মিলন ব্যতীরেকে সৃষ্টি অসম্ভব।

তন্ত্র সাধন মার্গে উপাস শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ উপবাস অথবা খালিপেটে নয়। তন্ত্র সাধনা মন্ত্র মূলক নয়, ক্রিয়ামুলক। তাই তন্ত্র সাধন মার্গে আরাধ্য দেবতাকে লাভ করা অথবা সন্তুষ্ট করার ক্রিয়া খালিপেটে করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। অতএব এক্ষেত্রে কুড়মালি ভাষার উপাস শব্দের বাংলা ভাষাতে ভাবার্থ সৃষ্টি হেতু অর্থাৎ বীজকে অঙ্কুরিত করা হেতু স্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ এবং সৃষ্টির আধার শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতির মিলন।

আম কুড়মি চড়ক পুজা অনুষ্ঠান পালন করে। তথাপি বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ কুড়মি পরিবার চড়ক পুজাতে ভগতার ভূমিকা পালনে অংশগ্রহণ করে এবং ভগতার নেগ-চার অর্থাৎ নিয়ম সংস্কার পালনে বাধ্য থাকে। স্রষ্টা সৃষ্টির উৎসে মিলিত হওয়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে সৃষ্টি। এক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হওয়া সুনিশ্চিত অতএব জাতাশৌচ দূরীভূত। বাংলা ভাষার জাতাশৌচদূরীভূত বাক্যটির কুড়মালি ভাষাতে অনুবাদ জনম ছুইত ছঁ।

কুড়মালি সংস্কৃতির অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতিতে কুড়মালি ভাষাতে পরবিআ চারি মাঁহাঁনগিত নাচের প্রাধান্য থাকাকে কেন্দ্র করে অনুমান করা যায় তন্ত্র সাধনার পঞ্চ ম কার সাধনার চতুর্থ ম কার মুদ্রা সাধনার প্রধান্য অধিক। মুদ্রা সাধনাতে সুর, তাল, লয়, মাত্রা সহযোগে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জনম ছুইত ছঁ হেল রিঝে রিঝাইকন মুদ্রা নাচ নাচটাই ছঁ নাচ। ছঁ নাচ সৃষ্টির উৎস কুড়মালি সংস্কৃতির জনম ছুঁইত ছঁ হেউঅন। সেই সূত্রে ছঁ নাচ কুড়মালি সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক নাচ। অতীতে চড়ক পুজাতে এই নাচ নাচা আরম্ভ হতো এবং রাজা সলহা অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে সমাপ্তি ঘটানো হতো। ছঁ নাচ তন্ত্র সাধনার মুদ্রা তাই এই নাচ বীর রসের নাচ। অতীতের ছঁ নাচ বর্তমানের ছৌ-নৃত্য নামের হেরফের ঘটানো হয়েছে। অর্থহীন শব্দে নামকরণ করা হয়েছে। মুদ্রার তালমাত্রা, ছন্দ বর্জন করে নাটকের তাল,মাত্রা, ছন্দ গ্রহণ করা হয়েছে। সময় সীমা লঙ্ঘন করে বাণিজ্যিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে যে কোনো সময় নাচের আসর বসানোর প্রচলন ঘটেছে। সমাজ, স্বদেশের গন্ডী ছড়িয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। অতীতে একা নাচ এবং মেল নাচ ব্যতীরেকে

অন্য কোনো নাচ নাচা হতো না। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু ধর্মের মহাকাব্যের যুদ্ধ নাচ নাচার প্রচলন যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে উক্ত নাচ প্রায় অবলুপ্ত। একা নাচ এবং মেল নাচ মুদ্রা অভ্যাসের পরিচায়ক। যেহেতু যুদ্ধ নাচের বাড়াবাড়ি ঘটেছে তাই মুখোশ ব্যবহারেরও বাড়াবাড়ি ঘটেছে। খেয়াল করে দেখুন যে ভূখন্ডে কুড়মি জাতির বসবাস সেই ভূখন্ডে মৃৎশিল্পীর বসবাস নাই বললেই চলে। অথচ মুখোশ ব্যবহারে বাড়াবাড়ি। নাচের ধরন পাল্টে নৃত্য শিল্পের আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য সাধুবাদ জানাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি এই শিল্পকে কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতবান কল, কুড়মি, কড়ার গন্ডীর বাইরে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি। সার্বজনীন স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এই সম্ভব হয়ে না উঠা সমৃদ্ধি বৃদ্ধির না উৎখাতের তা ভবিষ্যত বলবে।

শিখ-শিখর-নাগপুর-আধাআধি খড়গপুর এলাকার অর্থাৎ কুড়মি অধ্যুষিত এলাকার সমস্ত বুড়হাবাবার মড়পে সারারাত ব্যাপী জাঁকিয়ে ছঁ নাচের আসর বসানো হয় তাই এই রাতটিকে কুড়মালি ভাষাতে মুলকি রাইত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রাত্রি বলা হয়। নিশি সমাপনান্তে সংক্রান্তির সকালে আসর সাঙ্গ করা হয়।

পইঠা ঃ- ছঁ নাচের আসর সাঙ্গ। চড়ক পুজা আরম্ভ। সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা বুড়হাবাবার পুজা, ভগতা ঘুরা, ফুল গুঁহদা ইত্যাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়াকে পইঠা বলা হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে পরব এবং পূজা এই দুই ধরনের অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবে বলি প্রথার প্রচলন নাই কিন্তু পুজাতে হয় ছাগ না হয় ছাগী না হয় মুরগী না হয় শুকর অতি অবশ্যই বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ভেদাভেদ জ্ঞানহীনভাবে নারী-পুরুষ সমবেত হয়ে আনন্দ উপভোগ করাকে পরব বলে। কুড়মি সমাজে পরব মানেই মাঁস (মাংস) পিঠা (পিষ্টক)। তাই তো ঝাড়খন্ড মরমী কবি গেয়ে গেছেন 'মাস পিঠা হবেক মকরে' পরবে কুড়মি সমাজ চর্ব্য, চুষ্য লেহ্য, পেয় সকল প্রকার খাদ্যাদির প্রয়োজনাধিক আয়োজন করে থাকে। আরাধ্য দেব-দেবীর আরাধনা করাকে পুজা বলা হয়। আরাধ্য দেব-দেবীর করুনা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বলির পাঁঠাকে প্রথমে উৎসর্গ করা হয় তারপর যুপকাষ্ঠে চড়ানো হয়। অতএব পুজাতে ও কুড়মি ঘরে মাংসের ছড়াছড়ি। বাদ থাকে শুধু পিঠা। উৎসর্গ করার অর্থ নৈবেদ্যে পরিণত করা। অতএব বলিতে চড়িয়ে মাংস ভক্ষণ করা মানে প্রসাদ ভক্ষণ করা।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করার উপায় নাই চড়ক পুজাতে পাঁঠা অর্থাৎ ছাগ বলি দেওয়া প্রথার প্রচলন অতিমাত্রায় প্রচলিত আছে। এটা বহিরঙ্গ ভাবের প্রতিফলন। অন্তরঙ্গ ভাবে শস্য বীজকে অঙ্কুরিত করার প্রক্রিয়া মোতাবিক বাস্তব সত্য যৌন মিলনে মিলন যোগ্যা শস্য বীজের সাথে স্রষ্টার মিলন ঘটা মানে অনিবার্য্যভাবে স্রষ্টার বিন্দুপতন ঘটা। এক্ষেত্রে বিন্দুর প্রতীক পাঁঠা এবং পতন ঘটার প্রতীক বলি দেওয়া। স্রষ্টার বিন্দু পতন ঘটা বিশ্বাসে গভীরভাবে বিশ্বাসী কৃষিজীবি কুড়মি জাতি কৃষিজ শস্যবীজকে উক্ত সময়ে বুড়হাবাবার মড়পে নিয়ে গিয়ে মড়পের ধুলোবালি মাখিয়ে মানে মড়পের মাটির সাথে মিলন ঘটিয়ে

বাড়ীতে এনে আগামী মরশুমে কৃষিকর্মে ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করে। প্রকৃতি বিজ্ঞান বিশারদ কুড়মি জাতি প্রচলিত বর্ষ গণনার চৈত্র মাসের ষোল তারিখ থেকে বৈশাখ মাসের পহলা তারিখ পর্যন্ত ষোল দিন বসুমতি মাতার (বসমতামাঁইকর মাটির গুণ, সূর্য্য কিরণের উত্তাপ (সুরুজ ভগবানকর রাইসকর তাইত) এবং বায়ু প্রবাহের ঘর্ষণ গুণ (বাউ বহনিক রেতনগুণ) কৃষিজ শস্য বীজ অঙ্কুরিত হওয়া গুণে গুণ সম্পন্ন হয়ে ওঠার অনুকুল পরিবেশ থাকা গভীরভাবে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসকে যুগ পরম্পরা জিইয়ে রাখার পরিকল্পনা থেকেই চড়ক পুজার উদ্ভাবনা।

ফুল গুঁহদা ঃ গুঁহদা শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের শব্দ। বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ মাড়ানো। অতএব ফুল গুঁহদা অর্থ ফুল মাড়ানো। বলা হয় ফুল গুঁহদা কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে ফুল থাকে না। থাকে গনগনে আগুন। গনগনে আগুনের উপর তিন পা হাঁটাকে বলা হয় ফুল গুহদা। ভগতাগণ গণগণে আগুনের উপর হাঁটার অর্ন্তনিহিত অর্থ শস্য বিজকে তেজসতত্বের সাথে মিলন ঘটানো। অতএব ফুল গুঁহদা শস্য বীজকে তেজসতত্বের সাথে মিলন ঘটানোর প্রতীক।

ভগতা ঘুরা ঃ- ঘুরা শব্দটির বাংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ ঘুর্ণন করা। ভগতাগণ শূন্যে ঘূর্ণন করাকে ভগতা ঘুরা বলা হয়। শূন্যে অবস্থান করে ঘুর্নন করা কল্পনাতীত, অবাস্তব খেয়াল করে দেখুন যে খুঁটিতে ঝুলে ভগতাগণ ঘুর্ণন করেন সেই খুঁটিটির আকৃতি হুবহু ছাতার মতো। ছাতার মতো আকৃতির খুঁটিতে ভগতাগণকে কোমরে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং ঘোরানো হয়। এই অবস্থাতে ঘুর্নন করাকে ভগতা ঘুরা বলা হয়। অতীতে তন্ত্র সাধনার কুম্ভক অভ্যাসের দ্বারা কুম্ভ করত সাধকগণ শূন্যে ভাসমান অর্থাৎ বায়ুতে ভাসমান থাকতে সক্ষম ছিলেন। বায়ুতে ভাসমান থাকা বায়ুর ঘর্ষণ গুণে নিজেকে গুণসম্পন্ন করে তোলা। ভগতা ঘুরে শস্য বীজকে বায়ু তত্বের সাথে মিলন ঘটানোর পরিচায়ক। বর্তমানের ভগতা ঘুরা অতীতে কুম্ভকরত সাধকগনের প্রতীক।

কুঁড়হা (ছাতু) খাওয়া ঃ- বনজ খাদ্য বস্তুর অপ্রতুলতা হেতু কুড়মি জাতি উদরপুরনের খাদ্যবস্তুর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় লক্ষ্য করেছিল প্রকৃতি মাতার কোলে প্রকৃতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল প্রচুর যব শস্য দানা উৎপাদিত হতো বিনষ্ট হতো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুড়মি জাতি উক্ত যব শস্য দানা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছিল। যে পদ্ধতিতে যব শস্য দানা প্রাকৃতভাবে প্রকৃতি মাতার কোলে উৎপাদিত হতো সেই সেই পদ্ধতি অনুসরন করে কুড়মি জাতি কৃষিকর্ম পেশাতে যব শস্য দানা উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেছিল। তৎসূত্রে বলা যায় কুড়মি জাতি কৃষিকর্ম পেশা এবং উক্ত পেশাতে যব শস্য দানা উৎপাদনের পদ্ধতি সর্বপ্রথম আবিস্কার করেছিল। বলতে বাধা নেই যে অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিকর্ম পেশাতে যব শস্য দানা উৎপাদনের অনুকুল সেই অঞ্চলটি ইথোপিআ নামে প্রসিদ্ধ।

পরবর্ত্তী যুগে স্থানান্তরণে বাধ্য হয়ে কুড়মি জাতি নব আবিস্কৃত মেহালগড় (মেহরগড়) অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু সেই অঞ্চলটির প্রাকৃতিক পরিবেশ যব চাযের অনুকুল ছিল না। অতএব যব ও নেই। যব চাষও নেই। উক্ত ভুখন্ডের চাযের প্রাকৃতিক পরিবেশও নেই। তাই পুনঃরায় খাদ্যাভাবের তাড়না। প্রকৃতি মাতার সীমাহীন করুনাতে কুড়মি জাতি কৃষিকর্ম পেশাতে ঘরের বিকল্প উদর পুরনের প্রধান খাদ্য শস্য ধান উৎপাদন করার পদ্ধতি আবিস্কারে সক্ষম হয়েছে। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি কৃষিকর্ম পেশাটা পুরোপুরি কুড়মি জাতি মন প্রাণ দিয়ে করায়ত্ত করেছে। যব চাযের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে অর্থাৎ যব চাষ করাকে মুক্তি দিয়েছে। মুক্তি দেওয়াকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য পিন্ডদান প্রথা প্রচলিত আছে। তাই কুড়মি জাতি চৈত্র সংক্রান্তিতে আগামী মরশুমে ধান চায করার জন্য ধান বীজ শস্য দানা শোধন করে। অপরদিকে যব চাষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পিন্ড দান করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে কুঁড়হা খাওয়া যব চাষকে পিন্ড দান করার প্রতীক।

বুড়হাবাবাক নারতা (বুড়হাবাবার নরতা) ঃ-

কৃষিকর্ম পেশাতে উদর পুরনের খাদ্য শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে পুরুষ, প্রকৃতি, তাপ, বায়ু এবং বৃষ্টি। উক্ত পাঁচের মধ্যে সর্বপ্রধান পুরুষ যাকে বিন্দু বা ব্রহ্ম বলা হয়। সবার অলক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকে সেই পুরুষ উদ্ভিদ জগতের বীজ কন্দকে অঙ্কুরিত হওয়া গুণে গুণ সম্পন্ন করে তোলাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে চৈত্র মাসের ষোল তারিখ থেকে বৈশাখ মাসের পহলা তারিখের মধ্যে। বিশ্ব ব্রহ্মান্ড জীব জগৎ সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ মূলে যে বিন্দু অর্থাৎ পুরুষ সেই পুরুষকে কুড়মি জাতি বুড়হাবাবা নামে নামকরণ করেছে।

যেহেতু বুড়হাবাবা চৈত্র মাসের ষোল তারিখ থেকে বীজ কন্দকে অঙ্কুরি হওয়া গুণে গুণবান করে তোলাকে প্রভাবিত করা শুরু করে তাই কুড়মি জাতি উক্ত দিনটিকে বুড়হাবাবার জন্মদিন পালন করে। কুড়মি সমাজে শিশুর জন্ম হলেই নরতা পালন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেই সূত্রে বুড়হাবাবাক নারতা পালন প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত আছে।

১লা বৈশাখ বুড়হাবাবাক নারতা (নরতা) ঃ- নারতা শব্দটি কুড়মালি ভাষার নাইর এবং রেতা শব্দদ্বয় থেকে সৃষ্ট। নাইর এবং রেতা শব্দদ্বয় থেকে সৃষ্ট। নাইর শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ নাড়ী এবং রেতা শব্দের অর্থ ঘর্ষণ করা। নারতা শব্দের বাংলা ভাষাতে ভাবার্থ ঘর্ষণ করে নাড়ীচ্ছেদ্রন করা কারণে ঘঠা অশৌচ দূরীভূত করা অনুষ্ঠান। ভূমিষ্ঠ শিশু এবং প্রসুতি মাতার নাড়ী ঘর্ষণ করে ছেদন করা । নাড়ী ছেদন করাকে নাড়ীর মৃত্যু ঘটানো কল্পনা করা হয়েছিল। তাই শিশুর জন্ম গ্রহণে জাতাশৌচ পালন করা হয়। জাতাশৌচ দূরীভূত করা কারনে যে অনুষ্ঠান পালন করা হয় সেই অনুষ্ঠানকে নারতা বলা হয়। ভূমিষ্ঠ শিশু এবং প্রসূতি মাতার নাড়ী ঘর্ষণ করে ছেদন করা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ঘর্ষণকারী কেহ অবশ্যই থাকেন। কুড়মি সমাজে উক্ত ঘর্ষণকারীনিকে (ধাই মাঁই) ধাত্রী মাতা বলা হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কৃষি অধিষ্ঠাতা দেবতা বুড়হাবাবার নারতা সে ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ শিশু, প্রসূতি মাতা এবং ঘর্ষণকারীর পরিচয় জানা দরকার। কৃষিকর্ম আধারে ভূমিষ্ঠ শিশু বীজের অঙ্কুরকে কল্পনা করা হয়েছে। প্রসূতি মাতা

বীজকে কল্পনা করা হয়েছে। ঘর্ষণকারী পুরুষ অর্থাৎ বিন্দু। বিন্দুর বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকে ঘর্ষণের ফলে বীজের বা কন্দের খোসা পাৎলা হয়। পাৎলা খোসাকে বিদীর্ন করে অঙ্কুর সহজে অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুর বীজের মধ্যে অঙ্কুরিত হওয়ার সময় বীজের আকৃতি হয় বুড়হাবাবার সাথে সংযুক্ত থাকা স্ত্রীযোনির মতো যাকে গমভিরা বলা হয়। বীজের মধ্যে অঙ্কুরিত হওয়া অঙ্কুরের আকৃতি হয় পুরুযাঙ্গের মতো। অঙ্কুর যুক্ত বীজের আকৃতি হয় বুড়হাবাবার মতো। এত সব ক্রিয়া প্রক্রিয়ার কর্তা পুরুষ অর্থাৎ পুড়হাবাবা। এই ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ১লা বৈশাখে। তাই কুড়মি সমাজ ১লা বৈশাখ দিনে বুড়হাবাবাক নারতা অনুষ্ঠান পালন করে। কোনো কোনো এলাকাতে এই নারতা অনুষ্ঠানকে তেল হেরেইদ বলে। জনটা নারতা অহেটাই তেল হেরেইদ করম পরবে তন্ত্র সাধনার মুদ্রা ঃ- ভাদ্র মাসের চাঁদের শুক্ল পক্ষীয় একাদশী তিথিতে কুড়মি সমাজ করম পরব উৎসব পালন করে। এই সময় ধান গাছ কিশোর বয়সের (পহনা উমেইরকর) হয়ে থাকে। ধান গাছের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করে কৃষক কুড়মি জাতির মনে আনন্দে জোয়ার এসেছিল। আবার সংশয়ও দেখা দিয়েছিল। সংশয় দেখা দেওয়ার কারণ তারা জানতো ধান গাছ উদ্ভিদ। উদ্ভিদের পক্ষে সৃষ্টিতত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া জানা সম্ভব নয়। তাই ধান গাছ যদি ধান শস্য দানা সৃষ্টি করাতে অক্ষম হয় তাহলে কুড়মি জাতির সমুহ বিপদ। এই বিপদ মুক্ত হওয়ার উপায়ে তারা বিবেচনা করেছিল বিবাহিতা কিন্তু মাতৃত্বলাভ না করা নিজ কনয়াকে দিয়ে সৃষ্টি তত্বের প্রক্রিয়া আচরণ করানোর মাধ্যমে ধান গাছকে সৃষ্টি তত্ত্বের প্রক্রিয়া বিষয়ক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। সৃষ্টির উৎসস্থল গর্ভাশিয় (কইখ)। গর্ভাশিয় পরিস্কার থাকাতে স্ত্রীজাতি তাড়াতাড়ি গর্ভধারণে সক্ষম হয়। করম পরব উপলক্ষ্যে কুড়মি সমাজের মহিলাগণ মাসাবধি কালব্যাপী করম নাচ নাচে। বিশেষ ভাবে করম ডাইর পুজার সময় সমস্ত করম ব্রতীগণ (করমউতিরা) করম নাচ নাচতে বাধ্য থাকে। করম নাচ তন্ত্র সাধনার মুদ্রা বিশেষ। এই মুদ্রাতে অর্থাৎ করম নাচে স্ত্রীজাতির গর্ভাশিয় পরিস্কার হয়। তাড়াতাড়ি গর্ভাধারনে সক্ষম হয়।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে তন্ত্রের সংযুক্তির পথ ঃ- কুড়মালি সংস্কৃতির নিয়মে সংস্কারে (নেগে-চারে) আচরিত কর্মসমূহের কারণ অনুসন্ধানে সংস্কৃতি গড়ে উঠার পরিভাষা জানার প্রয়োজনীয়তার বোধজ্ঞান উদয় হয়। প্রতিটি জনগোষ্ঠী মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্ব্বাহের পথ অবলম্বন করে নিজ মাতৃভাষা আধারে তৎসূত্রে কুড়মি জাতির কুড়মালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাদের জীবন নির্বাহের তন্ত্র সাধন পথে এবং জীবিকা নির্ব্বাহের পথ কৃষিকর্মের পেশাগত কর্মের পথ অবলম্বনে তাদের মাতৃভাষা কুড়মালি ভাষা আধারে। তন্ত্র সাধনার বহু সাধক, ভাষাবিদ, গবেষক স্বীকার করে গেছেন তন্ত্র সাধনার থাষা দ্রাবীড় ভাষাতে কথ্যরূপে পাওয়া যায়। দ্রাবীড়িয় ভাষা মানেই কুড়মালি ভাষা। তৎসূত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় কুড়মি জাতির জীবন নির্ব্বহের পথ ছিল তন্ত্র ধর্ম। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু কুড়মি জাতীর জীবিকা নির্ব্বাহের পথ কৃষিকর্ম। কৃষিকর্মে সাফল্য লাবের পথ পুরুষ ও প্রকৃতির আরদাস আরাধনা উপাসনা। পুরুষ ও প্রকৃতির আরাধনা উপাসনার হাত ধরেই তন্ত্র ধর্মের

উদ্ভাবন বিকাশ লাভ। তৎসূত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় কুড়মি জাতি তন্ত্র ধর্মের উদ্ভাবক, ধারক এবং বাহক। তৃতীয়তঃ কুড়মি জাতি তাদের বুড়হাবাবা অন্যান্য সকলের শিবের উপাসক অর্থাৎ শৈব। শৈব মানেই তান্ত্রিক। অতএব কুড়মি জাতি তান্ত্রিক। তন্ত্র তাদের ধর্ম। কুড়মি জাতির জীবিকা নির্বাহের পথ কৃষিকর্ম। কৃষিকর্মের পেশাগত কর্ম এবং তন্ত্র সাধনের সাধন পথ মিলেমিশে একাকার হওয়ার পথ অবলম্বন করে কুড়মালি ভাষা আধারে কুড়মালি সংস্কৃতি গড়ে উঠার প্রমান পাওয়া যায়। তাই তো তন্ত্র সাধনার বহু সাধন ক্রিয়া এবং দেহাংশের বহু অংশের নামের শব্দ কুড়মালি ভাষার বর্নমালার বহু বর্ন প্রতীকরূপে ব্যবহারের প্রমান পাওয়া জায়। যেমন- 'ক' কার ব্রহ্মাযোনী অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর 'র' কার তেজসতত্ব অর্থ প্রকাশের প্রতীক অক্ষর 'আ' কার(া) বায়ুতত্ব প্রকাশের প্রতীক অক্ষর 'ম' কার বিন্দু বা ব্রহ্ম প্রকাশের প্রতীক অক্ষর। তদ্রুপ তন্ত্র সাধনার বহু ক্রিয়া কুড়মালি সংস্কৃতিতে সংযোজিত হওয়ার প্রমান পাওয়া যায়। যেমন- করম নাচ, আড়ইআ নাচ, ডবকা নাচ, ভগতা ঘুরা ইত্যাদি। উল্লেখিত সাধন ক্রিয়া এবং প্রতীক বর্ন ব্যবহারের ব্যাক্ষা এবং বিশ্লেষন শুরু করি এবং কুড়মালি সংস্কৃতিতে আচরিত নেগ চারের সাথে সামঞ্জস্যতা সন্ধান করি। এইটুকু পুঁজি নিয়ে মননশীলতাকে এই পুস্তক রচনার দিকে ধাবিত করি। ফলস্বরূপ আজ আপনাদেরকে পুস্তকখানি উপহার দিতে সক্ষম হলাম। এই পুস্তক পাঠান্তে কুড়মি জাতি যদি তাদের পূর্বপুরুষের আচরিত কুড়মালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হন এবং আপনাকে আপনানোর মানসিকতা পোষন করে কুড়মালি সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়ে উঠেন তাহলে শ্রম সার্থক হবে। নমস্কার। জহাইর।

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি